হিন্দুধর্ম শিক্ষা

পঞ্চম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

হিন্দুধর্ম শিক্ষা

পঞ্চম শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

(প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা
প্রফেসর নিরঞ্জন অধিকারী
প্রফেসর ড. দুলাল কান্তি ভৌমিক
প্রফেসর সুনীত কুমার ভদ্র
ড. অসীম সরকার

শিল্প সম্পাদনা
হাশেম খান

ছবি ও অলংকরণ
কান্তিদেব অধিকারী

প্রথম মুদ্রণ: আগস্ট ২০১২
দ্বিতীয় মুদ্রণ: সেপ্টেম্বর ২০২৩
পরিমার্জিত সংস্করণ: অক্টোবর ২০২৪

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গকথা

প্রাথমিক স্তর শিক্ষার ভিত্তিভূমি। প্রাথমিক শিক্ষা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমুখী ও পরিকল্পিত না হলে গোটা শিক্ষাব্যবস্থাই দুর্বল হয়ে পড়ে। এই বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ২০১০ সালের শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক স্তরকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের সাথে সংগতি রেখে প্রাথমিক স্তরের পরিসর বৃদ্ধি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তর এবং ধর্ম-বর্ণ কিংবা লৈঙ্গিক পরিচয় কোনো শিশুর শিক্ষাগ্রহণের পথে যেন বাধা না হয়ে দাঁড়ায় এ বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) একটি সমন্বিত শিক্ষাক্রম গ্রহণ করেছে। এই শিক্ষাক্রমে একদিকে শিক্ষাবিজ্ঞান ও উন্নতবিশ্বের শিক্ষাক্রম অনুসরণ করা হয়েছে, অন্যদিকে বাংলাদেশের চিরায়ত শিখন-শেখানো মূল্যবোধকেও গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষাকে অধিকতর জীবনমুখী ও ফলপ্রসূ করার প্রয়াস বাস্তব ভিত্তি পেয়েছে। বিশ্বায়নের বাস্তবতায় শিশুদের মনোজাগতিক অবস্থাকেও শিক্ষাক্রমে বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান-উপকরণ হলো পাঠ্যপুস্তক। এই কথাটি মাথায় রেখে এনসিটিবি প্রাথমিক স্তরসহ প্রতিটি স্তর ও শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সবসময় সচেষ্ট রয়েছে। প্রতিটি পুস্তক রচনা ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। শিশুমনের বিচিত্র কৌতূহল এবং ধারণক্ষমতা সম্পর্কে রাখা হয়েছে সজাগ দৃষ্টি। শিখন-শেখানো কার্যক্রম যেন একমুখী ও ক্লান্তিকর না হয়ে আনন্দের অনুষঙ্গ ওঠে সেদিকটি শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, প্রতিটি বই শিশুদের সুষম মনোদৈহিক বিকাশের সহায়ক হবে। একই সাথে তাদের কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা, অভিযোজন সক্ষমতা, দেশপ্রেম ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনের পথকেও সুগম করবে।

ধর্ম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দিন দিন ব্যাপক হয়ে উঠছে। প্রাথমিক স্তরে এর প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি। কারণ এই বয়সেই একজন মানুষের ধর্মীয় ও নৈতিক ভিত্তি দৃঢ়ভাবে গঠিত হয়। এ বিষয়টি মাথায় রেখে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে 'হিন্দুধর্ম শিক্ষা' পাঠ্যপুস্তকটি প্রণীত হয়েছে। বইটিতে ধর্মশিক্ষা দানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নৈতিক গুণাবলি অর্জনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বইটি রচনা, সম্পাদনা ও পরিমার্জনে যেসব বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষক নিবিড়ভাবে কাজ করেছেন তাঁদের বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁদের প্রতিও যাঁরা অলংকরণের মাধ্যমে বইটিকে শিশুদের জন্য চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকটিকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। সময় স্বল্পতার কারণে কিছু ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। সুধিজনের কাছ থেকে যৌক্তিক পরামর্শ ও নির্দেশনা পেলে সেগুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেওয়া হবে।

পরিশেষে বইটি যাদের জন্য, সেই কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সার্বিক কল্যাণ কামনা করছি।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	ঈশ্বর ও জীবসেবা	১–৬
দ্বিতীয় অধ্যায়	ঈশ্বরের স্বরূপ এবং উপাসনা ও প্রার্থনা	
প্রথম পরিচ্ছেদ	ঈশ্বরের স্বরূপ	৭–২১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	উপাসনা ও প্রার্থনা	২২–৩০
তৃতীয় অধ্যায়	হিন্দুধর্মের সাধারণ পরিচয়, ধর্মগ্রন্থ এবং মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারী	
প্রথম পরিচ্ছেদ	হিন্দুধর্মের সাধারণ পরিচয়	৩১–৩৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	ধর্মগ্রন্থ	৩৮–৪২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারী	৪৩–৫০
চতুর্থ অধ্যায়	ঈশ্বরের একত্ব, ধর্মীয় সাম্য ও সম্প্রীতি	৫১–৫৪
পঞ্চম অধ্যায়	শিষ্টাচার ও পরমতসহিষ্ণুতা	৫৫–৬১
ষষ্ঠ অধ্যায়	অহিংসা ও পরোপকার	৬২–৬৭
সপ্তম অধ্যায়	স্বাস্থ্যরক্ষা ও যোগব্যায়াম এবং আসন	
প্রথম পরিচ্ছেদ	স্বাস্থ্যরক্ষা ও যোগব্যায়াম	৬৮–৭৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	আসন	৭৪–৭৮
অষ্টম অধ্যায়	দেশপ্রেম	৭৯–৮৩
নবম অধ্যায়	ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি : পূজা-পার্বণ ও ধর্মক্ষেত্র	৮৪–৯০

প্রথম অধ্যায়

ঈশ্বর ও জীবসেবা

আমরা জানি, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। তিনি মানুষ, জীব-জন্তু, সাগর-নদী-পাহাড়, বৃক্ষলতা-ফুল-ফল, আকাশ-বাতাস, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা – সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর স্রষ্টা– জীব ও জগৎ তাঁর সৃষ্টি।

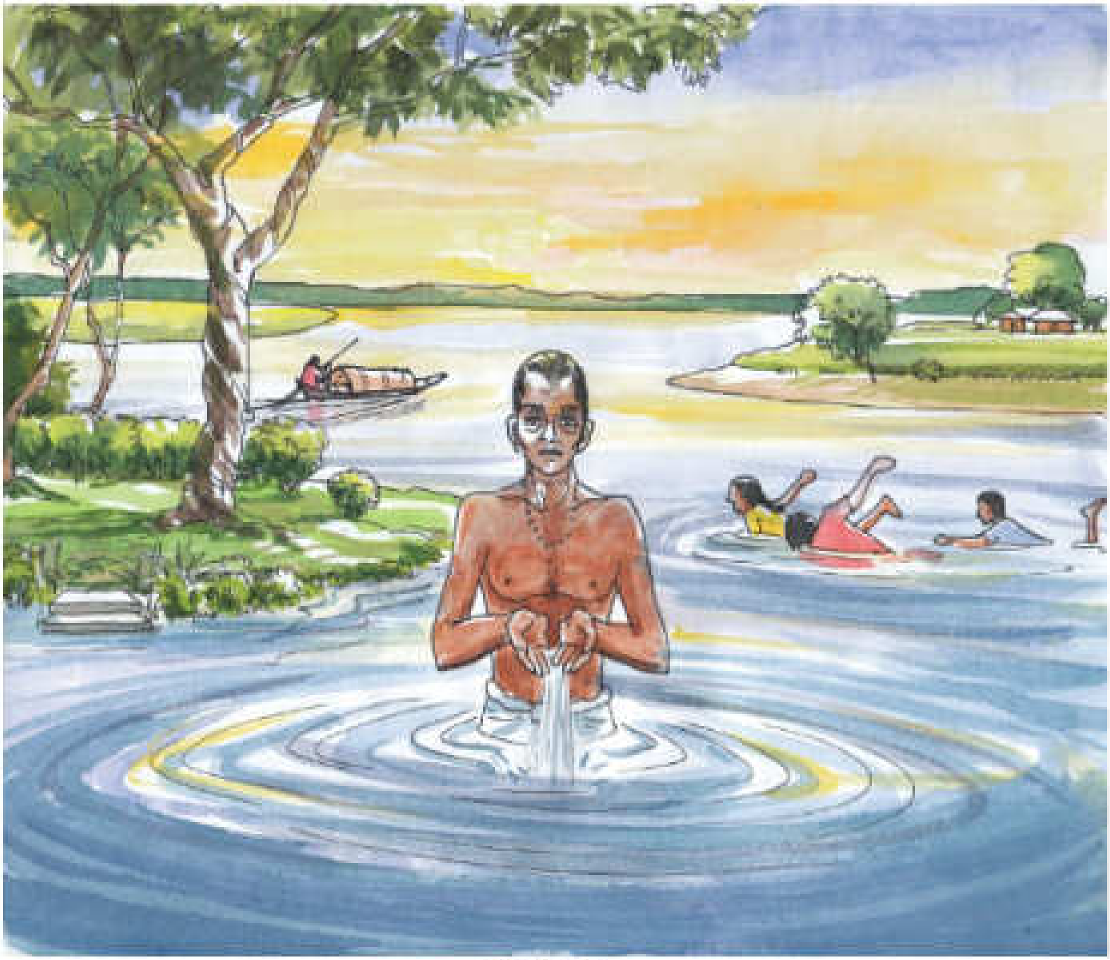

নিসর্গ দৃশ্য

ঈশ্বরের আরেক নাম পরমাত্মা। তিনি জীবের মধ্যেও অবস্থান করেন। জীবের মধ্যে অবস্থানকারী ঈশ্বরকে আত্মা বলে। ঈশ্বর জীবদেহে আত্মারূপে অবস্থান করে জীবকে পরিচালনা করেন। তাই জীবও ঈশ্বর।

আমরা ঈশ্বরের সেবা করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই। জীবনে চলার পথে তাঁর করুণা লাভ করতে চাই, যাতে আমাদের মঙ্গল হয়। তাই আমরা ঈশ্বরের স্তব-স্তুতি করি। ঈশ্বরকে আমরা কাছে পেতে চাই। কিন্তু ঈশ্বর নিরাকার। তাঁকে দেখা যায় না। তাঁর শক্তি ও গুণের প্রকাশকে প্রত্যক্ষ করা যায় মাত্র।

আমরা আরেকভাবে ঈশ্বরের সেবা করতে পারি। তা হলো জীবসেবা। ঈশ্বর আত্মারূপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন, তাই জীবের সেবা করলে তা ঈশ্বরেরই সেবা করা হয়। এভাবে জীবসেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সেবা করা যায়। তাই তো বলা হয়েছে — 'যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ।' যেখানে জীব, সেখানেই শিব। এখানে শিব মানে ঈশ্বর। এ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন,

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।'

এর মর্মার্থ হলো, ঈশ্বর জীবরূপে আমাদের সম্মুখে আছেন। তাঁকে বাইরে খোঁজার দরকার নেই। যিনি জীবের সেবা করেন, তিনি জীবসেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরেরই সেবা করেন।

সুতরাং জীবসেবাও ধর্ম। তাই আমরা জীবসেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সেবা করব। আমরা দরিদ্রের সেবা করব, আমরা পীড়িত ও আর্তের সেবা করব।

আমরা পোষা জীবজন্তুর পরিচর্যা করব। গাছপালা রোপণ করব। সেগুলোর পরিচর্যা করব। এভাবে আমরা জীবকে ঈশ্বর-জ্ঞানে সেবা করব। এতে জীবের মঙ্গল হবে। জীবসেবা করে নিজেরা শান্তি পাব। ঈশ্বরও সন্তুষ্ট হবেন।

তোমার নিজের বা অন্যের জীবসেবার ঘটনা বর্ণনা কর।

এখন ধর্মগ্রন্থ মহাভারত থেকে জীবসেবার একটি উপাখ্যান শোনাচ্ছি :

দরিদ্র ব্রাহ্মণের জীবসেবা

কুরুক্ষেত্র এ উপমহাদেশের একটি পবিত্র স্থান। কুরুক্ষেত্রকে ধর্মক্ষেত্রও বলা হয়। সেই কুরুক্ষেত্রে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। স্ত্রী, এক ছেলে ও ছেলের বউকে নিয়ে তাঁর ছোট সংসার।

কিন্তু সংসার ছোট হলে কী হবে! কোনোদিন তাদের খাওয়া জুটত, কোনোদিন আধপেটা থাকতে হতো। কোনোদিন একেবারেই না খেয়ে থাকতে হতো। কারণ ব্রাহ্মণ ধর্মসাধনা ও বিদ্যাচর্চায় সময় কাটাতেন। উঞ্ছবৃত্তি করে খাবার সংগ্রহ করতেন। উঞ্ছবৃত্তি হচ্ছে জমির ধান কেটে নেওয়ার পর জমিতে যা দু-এক ছড়া পড়ে থাকে, তা কুড়িয়ে নিয়ে তা দিয়ে খিদে মেটানো।

একক কাজ : 'উঞ্ছবৃত্তি' কথাটি বোঝাও।

একদিনের কথা।

ব্রাহ্মণ কোনো খাবার জোটাতে পারছেন না। খুবই খিদে পেয়েছে। স্ত্রী, ছেলে ও ছেলের বউও না খেয়ে আছে। পরে অতিকষ্টে কিছু যব সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। ব্রাহ্মণপত্নী সেই যব দিয়ে ছাতু বানালেন। তারপর সেই ছাতু চারভাগে ভাগ করলেন। চারজনে খাবেন।

জীবসেবা

২০২৫

ব্রাহ্মণ খেতে বসলেন।

এমন সময় সেখানে এলেন আরেক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। তিনি জানালেন, আমরা দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হয়েছি। অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটাচ্ছি। এখন আমি খুবই ক্ষুধার্ত।

ব্রাহ্মণ অতিথি ব্রাহ্মণকে হাতমুখ ধোয়ার জল দিলেন। বসার আসন দিলেন। পানীয় জল দিলেন। ক্লান্তি দূর হলো অতিথির। তারপর ব্রাহ্মণ নিজের ভাগের ছাতু অতিথিকে পরিবেশন করলেন। অত অল্পতে পেট ভরে! ব্রাহ্মণপত্নী তাঁর নিজের ভাগের ছাতুও দিয়ে দিলেন। এভাবে অতিথি ব্রাহ্মণের খিদে মেটাতে ব্রাহ্মণের পুত্রও তার ভাগের ছাতু দিয়ে দিলেন।

তবু খিদে মিটল না অতিথি ব্রাহ্মণের।

'আর আছে?'— জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

তখন ব্রাহ্মণের পুত্রবধূর ভাগের ছাতু অতিথির পাতে পরিবেশন করা হলো।

এভাবে ব্রাহ্মণ, তার স্ত্রী, পুত্র আর পুত্রবধূ নিজেরা ক্ষুধার্ত হয়েও জীবসেবার জন্য নিজেদের সামান্য খাদ্যও দান করলেন।

অতিথি ব্রাহ্মণ খুশি হয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

'তোমাদের সেবায় আমি সন্তুষ্ট হয়েছি।' — বললেন অতিথি ব্রাহ্মণ। সবাই তাকালেন তাঁর দিকে।

কোথায় ব্রাহ্মণ!

এ যে স্বয়ং ধর্মদেব।

'তোমাদের পরীক্ষা করতে এসেছিলাম।' — বললেন ধর্মদেব।

জীবসেবার এই আদর্শ আমরাও যেন মনেপ্রাণে ধারণ করি।

২০২৫

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। আমরা জানি, ______ সর্বশক্তিমান।
২। ঈশ্বর সকল ______ মধ্যে আছেন।
৩। জীবের ______ করলে ঈশ্বরের সেবা করা হয়।
৪। কুরুক্ষেত্রকে ______ বলা হয়।
৫। ব্রাহ্মণ ______ আদর্শ স্থাপন করেছিলেন।

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। জীবও →	ঈশ্বরের।
২। ঈশ্বর	তত্র শিবঃ।
৩। আমরা স্তব-স্তুতি করি	ছাতু।
৪। যত্র জীবঃ	মিষ্টান্ন।
৫। অতিথি খেয়েছিলেন	→ ঈশ্বর।
৬। প্রার্থনা করতে হয়	আত্মারূপে জীবের মধ্যে থাকেন।
	শ্রদ্ধার সঙ্গে।

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। জীবের মধ্যে ঈশ্বর কিরূপে অবস্থান করেন?

ক. দেবতারূপে খ. ভ্রমররূপে
গ. মনরূপে ঘ. আত্মারূপে

২। 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?' — কথাটি কে বলেছেন?

ক. রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব খ. স্বামী বিবেকানন্দ
গ. স্বামী লোকনাথানন্দ ঘ. স্বামী পূর্ণানন্দ

৩। ব্রাহ্মণ কীভাবে সংসার চালাতেন?

ক. পূজা করে খ. কীর্তন করে
গ. উঞ্ছবৃত্তি করে ঘ. ধর্মকথা শুনিয়ে

৪। অতিথি ব্রাহ্মণরূপে কে এসেছিলেন?

ক. ধর্মদেব খ. বিষ্ণু
গ. শিব ঘ. ইন্দ্র

৫। ব্রাহ্মণের পরিবারে কতজন সদস্য ছিল?

ক. একজন খ. দুজন
গ. তিনজন ঘ. চারজন

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। আত্মা বলতে কী বোঝ?
২। জীব বলতে কী বোঝ?
৩। ব্রাহ্মণের আর্থিক অবস্থা কেমন ছিল?
৪। ধর্মদেব অতিথি হয়ে এসেছিলেন কেন?
৫। আমরা কার সেবা করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। ঈশ্বর ও জীবের সম্পর্ক বুঝিয়ে লেখ।
২। আমরা জীবসেবা করব কেন?
৩। কীভাবে জীবের সেবা করা যায়?
৪। ব্রাহ্মণকে অতিথি ব্রাহ্মণ এসে কী বলেছিলেন?
৫। ব্রাহ্মণ ও তাঁর পরিবারের সবাই নিজেরা না খেয়ে অতিথি ব্রাহ্মণকে খাইয়েছিলেন কেন?

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঈশ্বরের স্বরূপ এবং উপাসনা ও প্রার্থনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঈশ্বরের স্বরূপ

আমরা জানি, ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর অনন্ত শক্তি। অন্ত মানে শেষ। অনন্ত মানে যার শেষ নেই। ঈশ্বরের শক্তির শেষ নেই। তিনি সর্বশক্তিমান। আবার ঈশ্বরের অনন্ত গুণ। তাঁর গুণেরও শেষ নেই। তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আমাদের তিনি পালন করেন। আমাদের জীবন, আমাদের মৃত্যু—সবকিছুর মূলেও তিনি। তাঁর সমান কেউ নেই।

ঈশ্বর নিরাকার। তবে তিনি যে কোনো আকার ধারণ করতে পারেন। ঈশ্বর যখন নিরাকার, তখন তাঁকে বলা হয় ব্রহ্ম। ব্রহ্ম সকল জীব ও জগতের উপর প্রভুত্ব করেন। তাই ব্রহ্মের আরেক নাম ঈশ্বর। ঈশ্বর শব্দটির মানে হচ্ছে প্রভু। এই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর যখন আমাদের কৃপা করেন, জগতের মঙ্গল করেন, তখন তাঁকে বলা হয় ভগবান।

নিচের ছকটি পূরণ করি :

১। ঈশ্বর যখন নিরাকার তখন তাঁকে বলা হয়	
২। সবকিছুর মূলে রয়েছেন	

ব্রহ্ম সকল প্রাণের উৎসস্বরূপ। তাঁর থেকেই জগতের সৃষ্টি। তাঁর মধ্যেই জগতের অবস্থান। আবার তিনিই আত্মারূপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। তাই ধর্মগ্রন্থ উপনিষদে বলা হয়েছে 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' অর্থাৎ, সবকিছুই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। সুতরাং ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান, দেব-দেবী এবং আত্মা — আলাদা কিছু নয়। একই ঈশ্বরের ভিন্ন-ভিন্ন নাম ও পরিচয়। জীবের মধ্যে আত্মারূপে ঈশ্বর অবস্থান করেন বলেই জীবকে ভালোবাসলে ঈশ্বরকেই ভালোবাসা হয়। তাই জীবকে ব্রহ্মজ্ঞানে সেবা করা আমাদের কর্তব্য।

২০২৫

ঈশ্বরের সাকার রূপ

দেব-দেবী

আমরা জানি, ঈশ্বরের কোনো আকার নেই। তিনি নিরাকার। তবে নিরাকার হলেও সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যে কোনো আকার ধারণ করতে পারেন। তিনি যে কোনো রূপে নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন। নিজের গুণ বা ক্ষমতাকে তিনি আকার দিতে পারেন। ঈশ্বরের কোনো গুণ বা ক্ষমতা যখন আকার বা রূপ পায়, তখন তাকে দেবতা বা দেব-দেবী বলে। দেব-দেবীর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরেরই শক্তির প্রকাশ ঘটে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ প্রভৃতি দেব-দেবী একই ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন শক্তি বা গুণের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। যেমন ঈশ্বর যে-রূপে সৃষ্টি করেন, তাঁর নাম ব্রহ্মা। যে-রূপে তিনি পালন করেন, তাঁর নাম বিষ্ণু। তাঁর শক্তির প্রকাশ ঘটেছে দেবী দুর্গার মধ্য দিয়ে। দেবী সরস্বতী যে-বিদ্যা দান করেন, তা ঈশ্বরেরই একটি গুণ। বেদ, পুরাণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে দেব-দেবীর রূপ, গুণ, শক্তি ও পূজা করার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। দেব-দেবীর পূজা করলে তাঁরা সন্তুষ্ট হন। দেব-দেবীরা সন্তুষ্ট হলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন। সুতরাং দেব-দেবীর পূজার মাধ্যমে ঈশ্বরেরই পূজা করা হয়।

নিচের ছকটি পূরণ করি :

১। ঈশ্বর যে-রূপে পালন করেন তাঁর নাম	
২। দেবী সরস্বতী যে-বিদ্যা দান করেন তা	

অবতার

কখনো কখনো পৃথিবীতে খুবই খারাপ অবস্থা বিরাজ করে। অশুভ শক্তির কাছে শুভ শক্তি পরাজিত হয়। মানুষ ধর্মকে ভুলে গিয়ে অধর্মের আশ্রয় নেয়। চারদিকে দুঃখের আর্তনাদ শোনা যায়। এ অবস্থা দেখে ধার্মিক ব্যক্তিদের হৃদয় কেঁদে ওঠে। তাঁরা ঈশ্বরের নিকট দুঃখ মোচনের আকুল প্রার্থনা জানান। তখন করুণাময় ঈশ্বর জগতের কল্যাণের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। তিনি অশান্তি দূর করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দুষ্কৃতিকারীদের ধ্বংস করেন, সাধু-সজ্জনদের রক্ষা করেন এবং ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন —

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ (৪/৭)
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ (৪/৮)

অর্থাৎ পৃথিবীতে যখনই ধর্মের গ্লানি হয় ও অধর্ম বেড়ে যায়, তখনই আমি নিজেকে সৃষ্টি করি। সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতিকারীদের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্যও আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

পৃথিবীতে ঈশ্বরের এরূপ অবতরণকে বলে অবতার। এভাবেই ঈশ্বর অবতাররূপে এসে মানুষের এবং জগতের মঙ্গল করেন।

দশ অবতারের পরিচয়

ভগবান বিষ্ণু বিভিন্ন যুগে দশটি অবতারে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। যেমন — মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ এবং কল্কি। লক্ষণীয়, দশ অবতারের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ নেই। এর কারণ হচ্ছে, অন্যান্য অবতার ভগবানের অংশবিশেষ। শ্রীমদ্‌ভাগবতপুরাণে বলা হয়েছে কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই ভগবান। তাই দশ অবতারের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ নেই।

এখানে সংক্ষেপে ভগবান বিষ্ণুর দশ অবতারের পরিচয় দিচ্ছি :

১। মৎস্য অবতার

হাজার হাজার বছর আগে সত্যব্রত নামে এক ধার্মিক রাজা ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে হঠাৎ পৃথিবীতে নানারূপ অন্যায়-অত্যাচার দেখা দেয়। রাজা তখন জগতের কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের করুণা কামনা করেন।

একদিন জলাশয়ে স্নানের সময় রাজা সত্যব্রতের নিকট একটি পুঁটি মাছ এসে প্রাণ ভিক্ষা চায়। রাজা কমণ্ডলুতে করে মাছটিকে বাড়ি নিয়ে এলেন। মাছটির আকার ভীষণভাবে বাড়তে থাকে। তাকে পুকুর, সরোবর, নদী, যেখানেই রাখা হয়, সেখানেই আর ধরে না। রাজা ভাবলেন, ইনি নিশ্চয়ই নারায়ণ। নারায়ণ বিষ্ণুর আরেক নাম। রাজা তখন মৎস্যরূপী নারায়ণের স্তব-স্তুতি করতে লাগলেন।

তারপর মৎস্যরূপী নারায়ণ রাজাকে বললেন, সাতদিনের মধ্যেই জগতের প্রলয় হবে। সে সময় তোমার ঘাটে এসে একটি স্বর্ণতরী ভিড়বে। তুমি বেদ, সব রকমের জীবদম্পতি, খাদ্য-শস্য ও বৃক্ষবীজ সংগ্রহ করে তাদের নিয়ে সেই নৌকায় উঠবে। আমি তখন শৃঙ্গধারী মৎস্যরূপে আবির্ভূত হবো। তুমি তোমার নৌকাটি আমার শৃঙ্গের সঙ্গে বেঁধে রাখবে।

মহাপ্রলয় শুরু হলো। রাজা মৎস্যরূপী ভগবান শ্রীবিষ্ণুর নির্দেশ মতো কাজ করলেন। ধ্বংস থেকে রক্ষা পেল তাঁর নৌকা। প্রলয় শেষে রাজা সমস্ত কিছু নিয়ে নৌকা থেকে নেমে এলেন। এভাবেই মৎস্য অবতাররূপে ভগবান শ্রীবিষ্ণু সৃষ্টিকে রক্ষা করলেন। বেদও সংরক্ষিত হলো।

মৎস্য অবতার

২। কূর্ম অবতার

পাতালবাসী অসুরেরা একবার দেবতাদের পরাজিত করে স্বর্গরাজ্য দখল করে। তখন ব্রহ্মা ও ইন্দ্র নিপীড়িত দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে শ্রীবিষ্ণুর কাছে গেলেন। অসুরদের অত্যাচারের কথা বললেন। শ্রীবিষ্ণু দেবতাদেরকে অসুরদের সঙ্গে নিয়ে ক্ষিরোদ সমুদ্র মন্থনের পরামর্শ দিলেন। তিনি বললেন, সমুদ্র মন্থনের ফলে যে অমৃত উঠে আসবে, তা পান করে দেবতাগণ অসুরদের পরাজিত করার শক্তি ফিরে পাবেন।

২০২৫

কূর্ম অবতার

দেবতাগণ সমুদ্র মন্থন শুরু করলেন। মন্দর পর্বত হলো মন্থন দণ্ড। আর বাসুকি নাগ হলো মন্থনের রজ্জু। মন্দর পর্বত সমুদ্রের তলায় বসে যেতে লাগল। শ্রীবিষ্ণু বিরাট এক কূর্ম বা কচ্ছপরূপে মন্দর পর্বতকে নিজের পিঠে ধারণ করলেন। মন্থন চলতে থাকল। সমুদ্র থেকে অমৃত উঠল। দেবতাগণ তা পান করলেন এবং অসুরদের পরাজিত করলেন। দেবতারা আবার স্বর্গরাজ্য ফিরে পেলেন। এভাবে কূর্মরূপী শ্রীবিষ্ণু অসুরদের অত্যাচার থেকে ত্রিজগৎ রক্ষা করলেন।

৩। বরাহ অবতার

একবার পৃথিবী জলে ডুবে যেতে থাকে। তখন শ্রীবিষ্ণু বরাহরূপে আবির্ভূত হয়ে পৃথিবীকে উদ্ধার করেন। তাঁর বিশাল দাঁত দিয়ে তিনি পৃথিবীকে জলের উপর তুলে ধরলেন। পৃথিবী রক্ষা পেল।

এছাড়া বরাহরূপী শ্রীবিষ্ণু দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষকে হত্যা করে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

বরাহ অবতার

নিচের ছকটি পূরণ করি :	
১। শ্রীবিষ্ণু মৎস্য অবতাররূপে সৃষ্টি ও বেদকে	
২। শ্রীবিষ্ণু মন্দর পর্বতকে ধারণ করলেন	
৩। পৃথিবী যখন জলে ডুবে যাচ্ছিল, তখন শ্রীবিষ্ণু	

৪। নৃসিংহ অবতার

শ্রীবিষ্ণু হিরণ্যাক্ষকে বধ করেছেন জেনে তাঁর ভাই হিরণ্যকশিপু খুব ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি প্রচণ্ড বিষ্ণুবিরোধী হয়ে উঠলেন। কিন্তু তাঁর একমাত্র পুত্র প্রহ্লাদ ছিল বিষ্ণুভক্ত। বিষ্ণুভক্ত পুত্রের আচরণে হিরণ্যকশিপু রেগে গেলেন। পুত্রকে হত্যা করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ভগবান বিষ্ণু প্রহ্লাদকে রক্ষা করলেন।

একদিন ক্রুদ্ধ হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর বিষ্ণু কোথায় থাকে ?'

প্রহ্লাদ উত্তর দিল, 'ভগবান বিষ্ণু সর্বত্রই আছেন।'

হিরণ্যকশিপু : তোর বিষ্ণু কি এই স্তম্ভের ভিতরেও আছে ?

নৃসিংহ অবতার

প্রহ্লাদ : হ্যাঁ বাবা, তিনি এখানেও আছেন।

হিরণ্যকশিপু পদাঘাতে সে স্তম্ভ ভেঙে ফেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই স্তম্ভের মধ্য থেকে ভগবান বিষ্ণু নৃসিংহরূপে আবির্ভূত হন। 'নৃ' মানে মানুষ। নৃসিংহ হচ্ছে মানুষ ও সিংহের মিলিত রূপ। মাথাটা সিংহের মতো। শরীরটা মানুষের মতো। আবার নখগুলো সিংহের মতো।

নৃসিংহ তাঁর ভয়ঙ্কর নখ দিয়ে হিরণ্যকশিপুর বক্ষ বিদীর্ণ করেন। হিরণ্যকশিপু নিহত হন। বিষ্ণুর ভক্তরা দৈত্যদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পান।

৫। বামন অবতার

বলি নামে অসুরদের এক রাজা ছিলেন। বলি দেবতাদের কাছ থেকে স্বর্গরাজ্য কেড়ে নেন। দেবতারা স্বর্গ হারিয়ে বিপদে পড়েন। তখন দেবতাদের রক্ষায় বিষ্ণু বামন রূপ ধারণ করলেন।

বলি বিরাট এক যজ্ঞ করছিলেন। যজ্ঞের সময় যে যা চাইছিলেন তাই তিনি দান করছিলেন। বামনরূপী বিষ্ণু বলির কাছে গিয়ে ত্রিপাদ ভূমি চাইলেন। বলি তা দিতে রাজি হলেন। সঙ্গে সঙ্গে বামন বিশাল আকার ধারণ করলেন। তিনি তার এক পা স্বর্গে এবং আর এক পা মর্ত্যে রাখেন। তৃতীয় পা রাখার কোনো জায়গা ছিলনা। অসুর হলেও প্রবল বিষ্ণুভক্তির কারণে বলি তার মাথার উপর সেটি রাখতে বলেন। বামনরূপী ভগবান বিষ্ণু তখন বলির মাথায় পা রেখে তাকে পাতালে নামিয়ে দিলেন। এভাবেই ভগবান বিষ্ণু অসুর রাজা বলিকে দমন করলেন। দেবতারাও তাঁদের হারানো স্বর্গরাজ্য ফিরে পেলেন।

বামন অবতার

২০২৫

৬। পরশুরাম অবতার

ত্রেতা যুগে এক সময়ে রাজা কার্তবীর্যের নেতৃত্বে ক্ষত্রিয়েরা খুব অত্যাচারী হয়ে ওঠে।

তখন সমাজে ধর্মভাব জাগাতে মহর্ষি ঋচীক তপস্যা করেন। তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ভগবান বিষ্ণু ঋচীকের পৌত্র এবং জমদগ্নির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম ছিল ভৃগুরাম। ভৃগুরাম ছিলেন মহাদেবের উপাসক। মহাদেব তুষ্ট হয়ে তাঁকে দিলেন একটি পরশু। পরশু মানে কুঠার। এই পরশু হলো তাঁর অস্ত্র। পরশু হাতে থাকায় তাঁর নাম হলো পরশুরাম। পরশু হাতে থাকলে কেউ তাঁকে পরাজিত করতে পারে না।

একদা ক্ষত্রিয় রাজা কার্তবীর্যের সঙ্গে পরশুরামের পিতা জমদগ্নির বিবাদ বেধে যায়। কার্তবীর্য ধ্যানমগ্ন জমদগ্নিকে হত্যা করেন। পরশুরাম পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে ছুটে যান। কুঠারের আঘাতে তিনি কার্তবীর্যকে হত্যা করেন। পরশুরাম একুশবার অত্যাচারী ক্ষত্রিয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের ধ্বংস করেন। পৃথিবীতে শান্তি ফিরে আসে। ধর্মের জয় হয়।

পরশুরাম অবতার

৭। রাম অবতার

ত্রেতা যুগে রাক্ষসরাজ রাবণ খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। তিনি দেবতাদের উপর অত্যাচার শুরু করেন। পৃথিবীতে অশান্তির সৃষ্টি হয়। তখন শ্রীবিষ্ণু রাজা দশরথের পুত্ররূপে রাম নামে আবির্ভূত হন। তিনি পিতৃসত্য পালনের জন্য স্ত্রী সীতা ও ভাই লক্ষ্মণকে নিয়ে বনবাসে যান। বন থেকে রাবণ সীতাকে হরণ করেন। রাম ও রাবণের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে রাবণ সবংশে নিহত হন। রাম সীতাকে উদ্ধার করে নিজ রাজ্যে ফিরে আসেন। স্বর্গ ও পৃথিবীতে শান্তি ফিরে আসে।

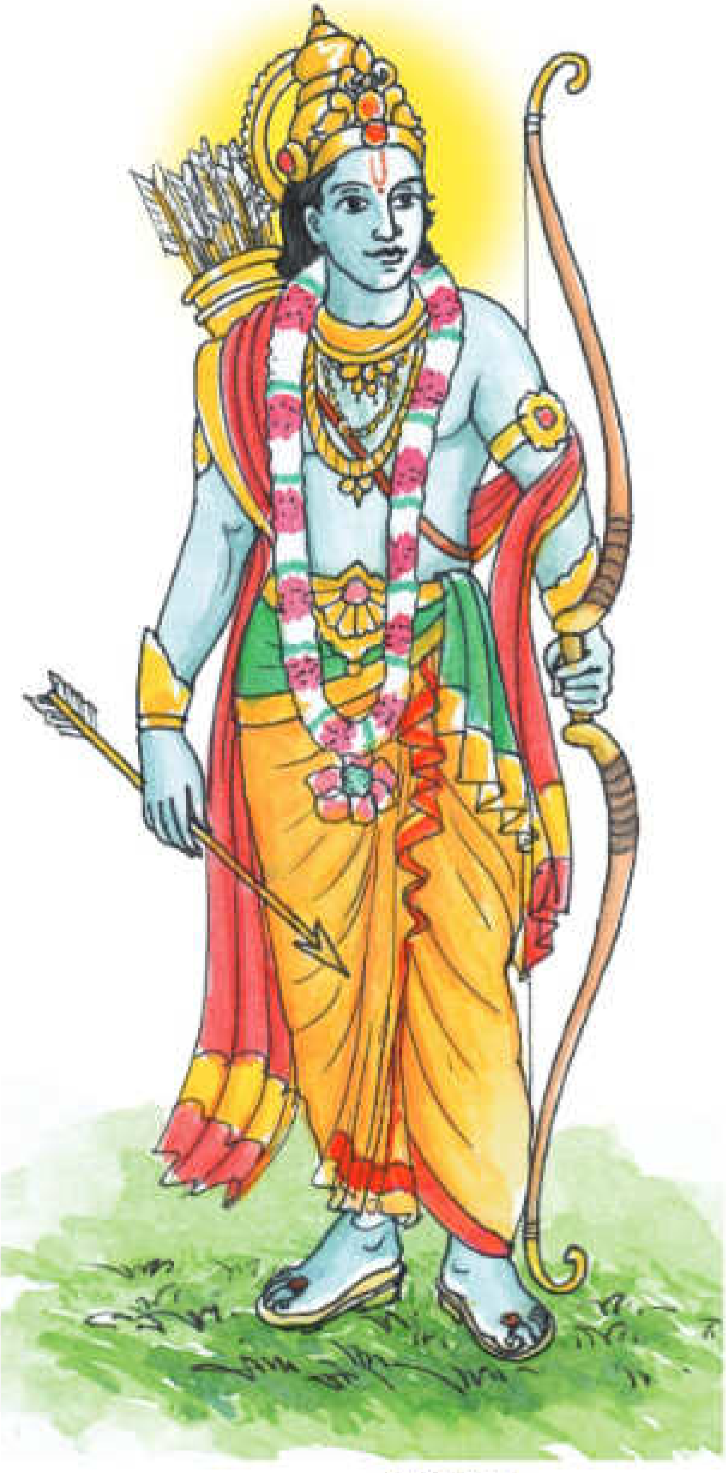

রাম অবতার

৮। বলরাম অবতার

দ্বাপর যুগে শ্রীবিষ্ণু বলরামরূপে অবতীর্ণ হন। তিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের বড় ভাই। বলরাম গদাযুদ্ধে শ্রেষ্ঠ বীর। তাঁর হাতে একটি লাঙল থাকত। এই লাঙল বা হল আকৃতির অস্ত্র দিয়ে তিনি যুদ্ধ করতেন। তাই তাকে বলা হয় হলধর। তিনি অনেক অত্যাচারীকে শাস্তি দেন। ফলে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

বলরাম অবতার

২০২৫

৯। বুদ্ধ অবতার

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে মানুষের মধ্য থেকে হিংসা, নীচতা দূর করতে শ্রীবিষ্ণু রাজা শুদ্ধোদনের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম রাখা হয় গৌতম। পরে তিনি 'বোধি' অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞান লাভ করে গৌতম বুদ্ধ নামে পরিচিত হন। তিনি অহিংসার বাণী প্রচার করে মানুষকে শান্তির পথ দেখান। তাঁর ধর্মের মূল কথা ছিল, 'জীবসেবা' এবং 'অহিংসা পরম ধর্ম।' তিনি জীবসেবা ও অহিংসার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছেন।

বুদ্ধ অবতার

১০। কল্কি অবতার

এতক্ষণ আমরা যে অবতারদের কথা জানলাম তাঁরা পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে গেছেন। কিন্তু কলি যুগের শেষ প্রান্তে অন্যায় দমন করতে শ্রীবিষ্ণু কল্কিরূপে আবির্ভূত হবেন। তিনি জীবের দুঃখ দূর করার জন্য সচেষ্ট হবেন। তাঁর হাতে থাকবে খড়্গ। এই খড়্গ দিয়ে তিনি অত্যাচারী ব্যক্তিদের হত্যা করবেন। মানুষের দুঃখ দূর হবে। পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

কল্কি অবতার

ঈশ্বর অবতাররূপে এভাবেই নেমে এসে জীবের কল্যাণ করেন। এভাবেও ঈশ্বর আমাদের একটি শিক্ষা দেন। তা হলো প্রয়োজনে দুষ্টদের দমন করতে হবে। সজ্জনদের শান্তিতে থাকার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। আর এর মধ্য দিয়ে ধর্ম অর্থাৎ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাহলে সমাজে থাকবে শৃঙ্খলা। মানুষও শান্তিতে বাস করতে পারবে।

২০২৫

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। ঈশ্বরের কোনো ______ নেই।

২। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী প্রভৃতি দেব-দেবী একই ______ বিভিন্ন রূপ।

৩। ব্রহ্মা ______ করেন।

৪। ______পালনকর্তা।

৫। বামন ______ অবতারের অন্যতম।

৬। পরশু হাতে থাকায় ভৃগুরামের নাম হলো ______।

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। ঈশ্বরের সাকার রূপ →	দুষ্টের দমন করেন।
২। দেব-দেবীদের সন্তুষ্ট করার জন্য	দেব-দেবী।
৩। অবতাররূপে ঈশ্বর	সন্তুষ্ট হন।
৪। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই	পূজা করা হয়।
৫। উপাসনা করলে দেব-দেবী	ইন্দ্র।
	ঈশ্বর।

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। ঈশ্বরের সাকার রূপ কী?

ক. ভগবান　　খ. দেব-দেবী

গ. গ্রহ　　ঘ. নক্ষত্র

২। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' — কথাটি কোন গ্রন্থে বলা হয়েছে?

ক. উপনিষদে　　খ. রামায়ণে

গ. মহাভারতে　　ঘ. ভাগবতে

৩। বিষ্ণুর অবতার কয়টি?

ক. আটটি　　খ. নয়টি

গ. দশটি　　ঘ. এগারোটি

৪। প্রহ্লাদের পিতার নাম কী?

ক. হিরণ্যাক্ষ খ. সত্যব্রত
গ. হিরণ্যকশিপু ঘ. গৌতম বুদ্ধ

৫। পরশু শব্দের অর্থ কী?

ক. লাঙল খ. খড়্গ
গ. চক্র ঘ. কুঠার

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। ব্রহ্ম কাকে বলে?
২। ঈশ্বর যখন কোনো রূপ ধারণ করেন তখন তাঁকে কী বলে?
৩। ব্রহ্মা কিসের দেবতা?
৪। অবতাররূপে পৃথিবীতে আসার পর ঈশ্বরের প্রধান কাজ কী?
৫। রাম কেন বনে গমন করেছিলেন?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। ব্রহ্ম ও ঈশ্বর বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
২। ঈশ্বর ও দেব-দেবীর সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।
৩। অবতার বলতে কী বোঝায়? সংক্ষেপে লেখ।
৪। পরশুরাম অবতারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
৫। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার অবতার সম্পর্কিত শ্লোকটি সরলার্থসহ লেখ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উপাসনা ও প্রার্থনা

উপাসনা

উপাসনা অর্থ ঈশ্বরকে স্মরণ করা। একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরকে ডাকা। ঈশ্বরের আরাধনা করা। উপাসনা ধর্মপালনের অন্যতম প্রধান অঙ্গ বা পদ্ধতি। ধ্যান, জপ, কীর্তন, পূজা, স্তব-স্তুতি, প্রার্থনা প্রভৃতি পদ্ধতিতে উপাসনা করা হয়।

একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরের চিন্তা করার নাম ধ্যান। নীরবে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করাকে বলে জপ। সরবে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ বা গুণগান করার নাম কীর্তন। ঈশ্বরের প্রশংসা করে তাঁর নাম উচ্চারণ করাকে বলা হয় স্তব বা স্তুতি।

উপাসনা করলে দেহ-মন পবিত্র হয়। উপাসনার সময় আমরা ঈশ্বরের প্রশংসা করি। তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। সকলের কল্যাণ কামনা করি।

নিচের ছকটি পূরণ করি :

উপাসনা করার তিনটি পদ্ধতির নাম লিখি :
১।
২।
৩।

সাকার উপাসনা

'সাকার' অর্থ যার আকার বা রূপ আছে। আকার বা রূপের মাধ্যমে ঈশ্বরের আরাধনা করাই সাকার উপাসনা। বিভিন্ন দেব-দেবী, যেমন — ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি ঈশ্বরের সাকার রূপ। আমরা ঈশ্বরকে দেব-দেবীর প্রতিমারূপে ও অবতাররূপে উপাসনা করি। এরূপ উপাসনায় ভক্ত ঈশ্বরকে সাকাররূপে কাছে পায়। তাঁকে পূজা করে। তাঁর নিকট প্রার্থনা করে।

২০২৩

নিরাকার উপাসনা

ঈশ্বরকে নিরাকারভাবেও উপাসনা করা যায়। নিরাকার উপাসনায় ভক্ত নিজের অন্তরে ঈশ্বরকে অনুভব করেন। ঈশ্বরের নাম জপ করেন অর্থাৎ নীরবে ঈশ্বরের নাম মনে মনে উচ্চারণ করেন। ঈশ্বরের নাম কীর্তন করেন। তাঁর স্তব-স্তুতি করে তাঁর নিকট প্রার্থনা জানান। নিজের ও জগতের কল্যাণ কামনা করেন।

উপাসনার পদ্ধতি সাকার বা নিরাকার যা-ই হোক-না-কেন, সবই ঈশ্বরের উপাসনা। ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে, নিরাকার ব্রহ্মই প্রয়োজনে সাকার রূপ ধারণ করেন। অর্থাৎ যিনি নিরাকার, তিনিই আবার সাকার। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'আমাকে যে যেভাবে ভজনা করে, আমি তাকে সেভাবেই কৃপা করি।' সুতরাং ঈশ্বরকে সাকার ও নিরাকার — দুভাবেই উপাসনা করা যায়।

নিরাকাররূপে ঈশ্বরের ধ্যান করা হয়। সাকাররূপে তাঁর পূজা করা হয়।

সুতরাং ধ্যান, জপ, কীর্তন, পূজা, স্তব-স্তুতি, প্রার্থনা প্রভৃতি পদ্ধতিতে আমরা ঈশ্বরের উপাসনা করব।

উপাসনা একটি নিত্যকর্ম। প্রতিদিন উপাসনা করতে হয়। প্রতিদিন সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় তিনবার ঈশ্বরের উপাসনা করা কর্তব্য। উপাসনার জন্য আমাদের দেহ-মনের পবিত্রতা প্রয়োজন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে উপাসনা করতে হয়। মন্দিরে বা ঘরে বসে উপাসনা করা যায়। দেবতার সামনে বসে সাকার উপাসনা করতে হয়। উপাসনার সময় সোজা হয়ে উত্তর বা পূর্ব দিকে মুখ করে বসতে হয়।

নিচের ছকটি পূরণ করি :

১। ঈশ্বরকে ব্রহ্মভাবে উপাসনা করাই	
২। প্রতিদিন উপাসনা করার সময়	

উপাসনা করার জন্য অনেক আসন বা বসার পদ্ধতি আছে। তবে পদ্মাসন ও সুখাসন উপাসনার জন্য বিশেষ উপযোগী। এখানে পদ্মাসন ও সুখাসনের ছবি দেওয়া হলো :

২০২৫

পদ্মাসন

সুখাসন

একা বসে যেমন উপাসনা করা যায়, তেমনি অনেকে একসঙ্গে বসেও উপাসনা করা যায়। অনেকে একসঙ্গে বসে উপাসনা করাকে সমবেত উপাসনা বলে।

এজন্য সপ্তাহের একটা নির্দিষ্ট দিনে সকলে মন্দিরে বা পবিত্র স্থানে মিলিত হয়ে একসঙ্গে বসে উপাসনা করতে হয়।

আমরা জানি, উপাসনার সময় আমরা ঈশ্বরের স্তুতি বা প্রশংসা করি। ঈশ্বরের মহিমা চিন্তা করি। উপাসনা আমাদেরকে সৎপথে বা ধর্মপথে পরিচালিত করে। তাই সৎপথে চলার জন্য আমরা নিয়মিত উপাসনা করব। ঈশ্বরের নিকট শক্তি প্রার্থনা করব। নিজের ও অন্যের মঙ্গল কামনা করব।

প্রার্থনা

প্রার্থনা হচ্ছে ঈশ্বরের নিকট কিছু চাওয়া। ঈশ্বর এ বিশ্বের সর্বময় কর্তা। তিনি করুণাময়। তাঁর দয়ার উপরেই আমাদের সবকিছু নির্ভর করে। তাই ঈশ্বরের নিকট আমাদের প্রাণের আবেদন জানাই। তাঁর কাছে নিজের ও অন্যের মঙ্গল কামনা করি। এই যে ঈশ্বরের কাছে কিছু চাওয়া, একেই বলে প্রার্থনা। উপাসনার একটি অঙ্গ হলো প্রার্থনা। উপাসনার সময় ছাড়াও আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করতে পারি। কোনো শুভ কাজের পূর্বে আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানাই। আবার কোনো বিপদে পড়লে বিপদ থেকে মুক্তির জন্যও আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানাই।

নিচের ছকটি পূরণ করি :

১। উপাসনার জন্য উপযোগী আসন হলো	
২। প্রার্থনা হচ্ছে	

প্রার্থনারত বালক-বালিকা

২০২৫

উপাসনার মতো প্রার্থনা করার সময়ও দেহ ও মন পবিত্র থাকা প্রয়োজন। সাধারণত করজোড়ে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করতে হয়। প্রার্থনার সময় মনে দীনতার ভাব থাকতে হবে। তিনি প্রভু, আমি তাঁর দাস, তিনি দাতা আমি গ্রহীতা—এরূপ মনোভাবই দীনতার ভাব। উপাসনার মতো প্রার্থনাও ঈশ্বরের নিকট একা বা সমবেতভাবে করা যায়।

মন্ত্র, শ্লোক ও প্রার্থনামূলক বাংলা কবিতা

বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে অনেক মন্ত্র ও শ্লোক রয়েছে। মন্ত্র ও শ্লোকে ঈশ্বর ও বিভিন্ন দেব-দেবীর স্তব করা হয়। স্তব বা স্তুতির অর্থ হচ্ছে ঈশ্বর বা দেব-দেবীর রূপ, গুণ ও মাহাত্ম্য কীর্তন করা। তাঁদের প্রশংসা করা, তাঁদের স্মরণ করা। শুধু স্তবই নয়, আমরা ঈশ্বর ও দেব-দেবীর কাছে প্রার্থনাও করি। যেন সকলের মঙ্গল হয়। সকলেই যেন শান্তি পায়।

হিন্দুধর্মের ধর্মগ্রন্থগুলোতে স্তব ও প্রার্থনামূলক অনেক মন্ত্র ও শ্লোক আছে। ধর্মগ্রন্থগুলো সংস্কৃত ভাষায় লেখা। তাই স্তব-স্তোত্রগুলোও সংস্কৃত ভাষায় রচিত। এছাড়া বাংলা ভাষায় অনেক প্রার্থনামূলক কবিতা আছে।

ঈশ্বর বা দেব-দেবীর স্তব করা হিন্দুধর্মের অঙ্গ। স্তব করলে ঈশ্বর ও দেব-দেবীগণ খুশি হন। তাঁরা আমাদের মঙ্গল করেন। স্তব করলে আমাদের মন পবিত্র হয়। মনে ঈশ্বরের অনুভূতি জাগ্রত হয়।

প্রার্থনা করার সময় আমরা মন্ত্র ও শ্লোকগুলো শুদ্ধভাবে আবৃত্তি করব। সেগুলোর বাংলা সরলার্থও জেনে রাখব।

নিচের ছকটি পূরণ করি :

১। উপাসনা দুই প্রকার	
২। নীরবে মন্ত্র বা শ্লোক উচ্চারণ করা	

আমরা এখন বেদ, উপনিষদ, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ও শ্রীশ্রীচণ্ডী থেকে কিছু মন্ত্র ও শ্লোক এবং সেগুলোর সরলার্থ জানব। প্রার্থনামূলক বাংলা কবিতাও শিখব।

বেদ

সবিতা পশ্চাতাৎ সবিতা পুরস্তাৎ
সবিতোত্তরাত্তাৎ সবিতাধরাত্তাৎ।
সবিতা নঃ সুবতু সর্বতাতিং
সবিতা নো রাসতাং দীর্ঘমায়ুঃ ॥

(ঋগ্‌বেদ, ১০/৩৬/১৪)

সরলার্থ

কি পশ্চিম দিকে, কি পূর্ব দিকে, কি উত্তর দিকে, কি দক্ষিণ দিকে — সূর্যদেব আমাদের পরিপূর্ণতা দিন, সূর্যদেব আমাদের পরমায়ু দীর্ঘ করুন।

উপনিষদ

যুক্ত্বায় মনসা দেবান্
সুবর্যতো ধিয়া দিবম্।
বৃহজ্‌জ্যোতি করিষ্যতঃ
সবিতা প্রসুবাতি তান্ ॥

(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, ২/৩)

সরলার্থ

সূর্যদেব আমার মনকে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত করুন। পরমাত্মা অভিমুখী ইন্দ্রিয়গুলোকে জ্ঞানের দ্বারা সেই পরমাত্মাকে উপলব্ধি করার শক্তি দিন।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥

(শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, ১১/১৬)

সরলার্থ

অসংখ্য তোমার হাত, অসংখ্য উদর, অসংখ্য মুখ ও চোখ। তোমার অনন্ত রূপ আমি সর্বত্র দেখছি। কিন্তু হে বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ, তোমার আদি, অন্ত, মধ্য কোথাও কিছু খুঁজে পাচ্ছি না।

শ্রীশ্রীচণ্ডী

শরণাগত দীনার্ত পরিত্রাণ পরায়ণে।
সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
(শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১১/১২)

সরলার্থ

হে দেবী, শরণাগত, দরিদ্র ও পীড়িতজনের পরিত্রাণকারিণী, সকলের দুঃখবিনাশিনী, হে নারায়ণী, তোমাকে প্রণাম জানাই।

বাংলা প্রার্থনামূলক কবিতা

গাব তোমার সুরে   দাও সে বীণাযন্ত্র
শুনব তোমার বাণী   দাও সে অমর মন্ত্র।
করব তোমার সেবা   দাও সে পরম শক্তি,
চাইব তোমার মুখে   দাও সে অচল ভক্তি॥
সইব তোমার আঘাত   দাও সে বিপুল ধৈর্য,
বইব তোমার ধ্বজা   দাও সে অটল স্থৈর্য॥
(সংক্ষেপিত)

[গীতবিতান (পূজাপর্ব, গান — ৯৭), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

এ পরিচ্ছেদে যে-সকল ধর্মগ্রন্থ থেকে মন্ত্র বা শ্লোক নেওয়া হয়েছে, সেগুলো থেকে তিনটি ধর্মগ্রন্থের নাম লিখি :

১।
২।
৩।

এভাবে উপাসনা ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ইষ্ট দেবতার নাম সংকীর্তন করতে হয়।

উপাসনা ও প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। প্রার্থনা ও উপাসনার মাধ্যমে মনে স্থিরতা ও একাগ্রতা আসে। এ একাগ্রতা শুধু ধর্মের ক্ষেত্রে নয়, জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজন।

উপাসনা ও প্রার্থনা করে আমরা সৎ ও ধার্মিক হতে পারি। আর আমরা সকলে ধার্মিক হলে আমাদের সমাজ শান্তিপূর্ণ হবে। আমরা সকলে ভালো থাকব। তাই সকলের মঙ্গলের জন্য আমরা প্রার্থনা করব।

২০২৫

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। ঈশ্বর নিরাকার, তবে তিনি ______ হতে পারেন।
২। নিয়মিত উপাসনা করা আমাদের ______ ।
৩। পদ্মাসন ও ______ উপাসনার জন্য বিশেষ উপযোগী।
৪। প্রার্থনা হচ্ছে ঈশ্বরের নিকট কিছু ______ ।
৫। প্রার্থনা করার সময় দেহ ও মন ______ থাকা প্রয়োজন।

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। মন্ত্র ও শ্লোক শুদ্ধভাবে আবৃত্তি করা হয়	দীনতার ভাব থাকতে হবে।
২। উপাসনা মানুষকে সৎপথে	সাকার উপাসনা।
৩। প্রার্থনার সময় মনে	প্রার্থনা করার সময়।
৪। ঈশ্বরকে ব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা করাই	পরিচালিত করে।
৫। বিভিন্ন দেব-দেবীকে প্রতিমায় আরাধনা করা	পূজা করা হয়।
	নিরাকার উপাসনা।

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। উপাসনা কিসের অঙ্গ?

ক. মনের খ. দেহের
গ. ধর্মের ঘ. কর্মের

২। উপাসনা কয় প্রকার?

ক. দুই প্রকার খ. চার প্রকার
গ. ছয় প্রকার ঘ. আট প্রকার

৩। উপাসনা একটি —

ক. সাপ্তাহিক কর্ম খ. পাক্ষিক কর্ম
গ. মাসিক কর্ম ঘ. নিত্যকর্ম

২০২৩

৪। উপাসনা করলে —

ক. দেহ ও মন পবিত্র হয়　　খ. জনবল বাড়ে
গ. মান-সম্মান বাড়ে　　ঘ. শরীর সুস্থ হয়

৫। গাব তোমার সুরে দাও সে বীণাযন্ত্র — কথাটি কে বলেছেন?

ক. নরেন্দ্রনাথ　　খ. সত্যেন্দ্রনাথ
গ. রবীন্দ্রনাথ　　ঘ. দ্বিজেন্দ্রনাথ

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। উপাসনা কাকে বলে?
২। নিরাকার উপাসনা কাকে বলে?
৩। সাকার উপাসনা কাকে বলে?
৪। উপাসনার দুটি আসনের নাম লেখ।
৫। কীভাবে প্রার্থনা করতে হয়?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। উপাসনার অর্থ কী? সাকার ও নিরাকার উপাসনার বর্ণনা দাও।
২। উপনিষদ থেকে প্রদত্ত প্রার্থনামূলক মন্ত্রটি সরলার্থসহ লেখ।
৩। আমরা উপাসনা করব কেন? — ব্যাখ্যা কর।
৪। প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা কী?
৫। তোমার পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলা প্রার্থনামূলক কবিতাটি লেখ।

২০২৫

তৃতীয় অধ্যায়

হিন্দুধর্মের সাধারণ পরিচয়, ধর্মগ্রন্থ এবং মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারী

প্রথম পরিচ্ছেদ

হিন্দুধর্মের সাধারণ পরিচয়

হিন্দুধর্ম পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মসমূহের অন্যতম।

'হিন্দু' শব্দের উৎপত্তি পারসিকদের দ্বারা। বর্তমান ইরানের প্রাচীন নাম ছিল পারস্য। পারস্যের অধিবাসীরাই ছিলেন পারসিক। তাঁরা 'স'-এর স্থলে 'হ' উচ্চারণ করতেন। তাই তাঁরা উত্তর-পশ্চিম ভারতের সিন্ধু অঞ্চল দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশের সময় সিন্ধুকে বলতেন হিন্দু। এ থেকে ভারতবর্ষের এক নাম হয় হিন্দুস্থান। হিন্দুস্থানের অধিবাসীদের নাম হয় হিন্দু। আর তাদের ধর্মের নাম হয় হিন্দুধর্ম।

হিন্দুধর্মের প্রাচীন নাম সনাতন ধর্ম। 'সনাতন' শব্দের অর্থ চিরন্তন, চিরস্থায়ী, নিত্য। যা ছিল, আছে ও থাকবে — তা-ই সনাতন। কতিপয় চিরন্তন ভাবনা-চিন্তার উপর ভিত্তি করে এ ধর্মের উৎপত্তি। তাছাড়া হিন্দুধর্ম নির্দিষ্ট কোনো সময়ে একক কারো দ্বারা প্রবর্তিত নয়। একাধিক মুনি-ঋষির সমন্বিত চিন্তার ফল এটি। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এর আচার-আচরণগত অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তবে মৌলিক তত্ত্বের কোনো পরিবর্তন হয়নি। এ অর্থেও এ ধর্মকে সনাতন ধর্ম বলা হয়। সুতরাং সনাতন ধর্মেরই আরেক নাম হিন্দুধর্ম।

হিন্দুধর্মকে বৈদিক ধর্মও বলা হয়। কারণ বেদ হিন্দুধর্মের মূল ভিত্তি। বেদের দুটি অংশ। প্রত্যেক অংশকে বলা হয় কাণ্ড। বেদ দুটি অংশে বা দুই কাণ্ডে বিভক্ত — জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড। জ্ঞানকাণ্ডের বিষয়বস্তু হচ্ছে ব্রহ্ম সম্পর্কে জ্ঞান। ব্রহ্ম নিরাকার। আবার আত্মারূপে তিনি সকল জীবের মধ্যে বিরাজমান।

২০২৫

কর্মকাণ্ডে আছে বিভিন্ন যাগ-যজ্ঞের কথা। বৈদিক যুগে প্রধান ধর্মীয় ক্রিয়া-কর্ম ছিল যাগ-যজ্ঞ। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে যাগ-যজ্ঞ করা হতো। ব্রহ্মের বিভিন্ন শক্তিকে লক্ষ করে মুনি-ঋষিরা বিভিন্ন দেব-দেবীর কল্পনা করেছিলেন। যেমন—ইন্দ্র, বরুণ, যম, মিত্র, উষা প্রভৃতি। বৈদিক দেব-দেবীরা ছিলেন নিরাকার। তাঁদের কোনো মূর্তি গড়া হতো না। যজ্ঞে এসব দেব-দেবীদের আহ্বান করা হতো। প্রথমে তাঁদের প্রশংসা করা হতো। পরে তাঁদের নিকট কাম্য বস্তু প্রার্থনা করা হতো। যজ্ঞের ফলে মানুষ পুণ্য অর্জন করত এবং তাতে স্বর্গলাভও ঘটত।

নিচের ছকটি পূরণ করি :

১। বেদের দুটি কান্ড	
২। তিনজন বৈদিক দেবতার নাম	
৩। হিন্দুধর্মের আরও দুটি নাম	

বৈদিক যুগের পরে আসে পৌরাণিক যুগ। এ সময় মানুষ যাগ-যজ্ঞের পরিমাণ কমিয়ে দিয়ে পূজা-পার্বণ করতে থাকে। তখন অনেক নতুন দেব-দেবীর আবির্ভাব ঘটে। যেমন — ব্রহ্মা, দুর্গা, কালী, কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি। বিভিন্ন পুরাণে এঁদের বর্ণনা আছে। সেই অনুযায়ী এঁদের মূর্তি তৈরি করে পূজা করা হয়। পূজার মধ্য দিয়ে এঁদের কাছে জীবনে সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ইত্যাদি কামনা করা হয়।

আধুনিক যুগে এসব দেব-দেবীর পূজার্চনার পাশাপাশি বিভিন্ন মহাপুরুষের আবির্ভাব ও তিরোধান দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়। যেমন — শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, প্রভু জগদ্বন্ধু, হরিচাঁদ ঠাকুর, মা সারদা দেবী, মা আনন্দময়ী প্রমুখের জন্ম ও মৃত্যু দিবস উপলক্ষে নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা হয়। এছাড়া নামকীর্তন, তীর্থভ্রমণ, তীর্থস্নান এসবের মাধ্যমেও ধর্মচর্চা করা হয়।

নিত্যকর্ম

নিত্যকর্ম ধর্মচর্চার একটি অঙ্গ। ধর্মচর্চা করতে গেলে শরীর ও মন সুস্থ থাকতে হয়। নিত্যকর্মের ফলে শরীর ও মন সুস্থ থাকে। এজন্য প্রতিদিন নিয়ম মেনে কিছু কর্ম করতে হয়। তাকেই বলে নিত্যকর্ম। নিত্যকর্ম ছয় প্রকার, যথা — প্রাতঃকৃত্য, পূর্বাহ্ণকৃত্য, মধ্যাহ্নকৃত্য, অপরাহ্ণকৃত্য, সায়াহ্নকৃত্য ও রাত্রিকৃত্য।

প্রাতঃকৃত্য : সূর্যোদয়ের কিছু আগে ঘুম থেকে উঠতে হয়। তারপর বিছানায় বসে পূর্ব বা উত্তরমুখী হয়ে ঈশ্বর বা দেব-দেবীর স্মরণ করে মন্ত্র পাঠ করতে হয়।

পূর্বাহ্নকৃত্য : প্রাতঃকৃত্যের পরে এবং মধ্যাহ্ন বা দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত যে-সকল কাজ করা হয় তা-ই পূর্বাহ্নকৃত্য। এ সময় প্রার্থনা ও পূজা করে দিনের অন্যান্য কাজ-কর্ম করতে হয়।

মধ্যাহ্নকৃত্য : দুপুরের কাজ খাওয়া ও বিশ্রাম। এটাই মধ্যাহ্নকৃত্য।

অপরাহ্নকৃত্য : দুপুরের পর এবং সায়াহ্নের পূর্ব পর্যন্ত যে কাজ করা হয় তাকেই বলে অপরাহ্নকৃত্য। এ সময় খেলাধুলা, ব্যায়াম বা ভ্রমণ করলে শরীর ভালো থাকে।

সায়াহ্নকৃত্য : সায়াহ্ন মানে সন্ধ্যা। সন্ধ্যাকালে হাত, পা ও মুখ ধুয়ে পরিচ্ছন্ন হতে হয়। তারপর ঈশ্বরের উপাসনা করতে হয়।

রাত্রিকৃত্য : সন্ধ্যার পর রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত কাজকে বলে রাত্রিকৃত্য। এ সময় অধ্যয়ন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ করা হয়। রাতের আহার গ্রহণ করতে হয়। তারপর ভগবানের এক নাম 'পদ্মনাভ' বলে ঘুমাতে হয়।

নিত্যকর্মের ফলে নিয়মানুবর্তিতা শেখা যায়। সময়ের কাজ সময়ে করা যায়। কোনো কাজই অসমাপ্ত থাকে না। শরীর-মন ভালো থাকে। যে কোনো কাজে পুরোপুরি মনোযোগ দেওয়া যায়। মানুষের প্রতি প্রীতি জন্মে। ঈশ্বরের প্রতিও ভক্তি আসে। অতএব, আমরা সবাই নিয়মিত নিত্যকর্ম করব।

জন্মান্তর ও কর্মফল

হিন্দুধর্ম আত্মায় বিশ্বাস করে। প্রত্যেক জীবের মধ্যে আত্মা আছে। সেই আত্মা অমর অর্থাৎ আত্মার মৃত্যু নেই। মৃত্যু আছে দেহের। দেহ জীর্ণ বা পুরাতন হলে তার মৃত্যু ঘটে। আত্মা তখন নতুন দেহ ধারণ করে। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন :

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥

(২/২২)

২০১৫

অর্থাৎ মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে, আত্মাও তেমনি জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর ধারণ করে।

আত্মার এই নতুন শরীর ধারণ করাকেই বলে জন্মান্তর। অর্থাৎ মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত জীবাত্মা পুনঃপুন জন্মগ্রহণ করে।

এই জন্মান্তরের সঙ্গে কর্মফলের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কর্মফল মানে কর্মের ফল। যেমন কর্ম তেমন ফল। ভালো কর্ম করলে ভালো ফল। খারাপ কর্ম করলে খারাপ ফল। জীব এ জন্মে যেমন কর্ম করবে, সেই অনুযায়ী তার পরবর্তী জন্ম হবে। ভালো কর্ম করলে ভালো জন্ম হবে। খারাপ কর্ম করলে খারাপ জন্ম হবে। আবার এ জন্মের ফল আগামী জন্মে তাকে ভোগও করতে হবে। তাই আমরা সবসময় ভালো কর্ম করব। তাহলে তার ফল ভালো হবে।

পাপ-পুণ্য ও স্বর্গ-নরক

পাপ হচ্ছে খারাপ কাজের ফল। আর পুণ্য হচ্ছে ভালো কাজের ফল। জীবহত্যা, পরনিন্দা, পরচর্চা, পরের ক্ষতি করা, মিথ্যা বলা, হিংসা করা ইত্যাদি হচ্ছে খারাপ কাজ। এর ফলে পাপ হয়। আর জীবে দয়া, পরনিন্দা না করা, পরচর্চা না করা, পরের উপকার করা, মিথ্যা না বলা ইত্যাদি হচ্ছে ভালো কাজ। এর ফলে পুণ্য হয়। যাঁরা পুণ্য অর্জন করেন, মৃত্যুর পর তাঁরা স্বর্গে যান। স্বর্গে অনন্ত সুখ। সেখানে রোগ, শোক, জরা, ব্যাধি কিছুই নেই। স্বর্গ দেবতাদের বাসস্থান। ইন্দ্র দেবতাদের রাজা। তাঁর রাজধানীর নাম অমরাবতী। জীব কিন্তু স্বর্গে স্থায়ীভাবে থাকতে পারে না। অর্জিত পুণ্য শেষ হলে তাকে আবার পৃথিবীতে জন্ম নিতে হয়।

নিচের ছকটি পূরণ করি :

১। খারাপ কাজের ফল	
২। ভালো কাজের ফল	

নরক হচ্ছে ভীষণ কষ্টের জায়গা। মৃত্যুর পর পাপীরা নরকে যায়। নরকের বিভিন্ন ভেদ আছে। যেমন — তামিস্র, অন্ধতামিস্র, রৌরব ইত্যাদি। পাপের কমবেশি অনুযায়ী পাপীদের এসব নরকে পাঠানো হয়। যে যেমন পাপ করে, তার তেমন শাস্তি হয়। পাপের ফলভোগ শেষ হলে পাপী নরক-যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে। এরপর পৃথিবীতে এসে কর্মফল অনুযায়ী তার আবার নতুন জন্ম হয়।

মোক্ষ ও জগতের কল্যাণ

'মোক্ষ' শব্দের অর্থ মুক্তি। জন্মান্তর বা পুনর্জন্মের আবর্ত থেকে ঈশ্বর বা পরমাত্মা বা পরম ব্রহ্মের সঙ্গে জীবাত্মার মিলনই হলো মুক্তি বা মোক্ষ। আর জগতের কল্যাণ হলো জগতের সকল জীবের মঙ্গল করা। কেবল নিজের কল্যাণ নয়, জগতের সকলের কল্যাণ করতে হবে — এটা হিন্দুধর্মের একটি প্রধান আদর্শ।

আগেই বলেছি যে, কর্মফল ভোগ করার জন্য জীবের জন্মান্তর বা পুনর্জন্ম হয়। এই কর্ম হচ্ছে দুই রকমের — সকাম কর্ম ও নিষ্কাম কর্ম। সকাম কর্ম হলো ফলভোগের আশা করে যে কর্ম করা হয় তা। এরূপ কর্ম যে করে তাকে বারবার জন্ম নিতে হয়। আর নিষ্কাম কর্ম হলো ফলভোগের আশা না করে যে কাজ করা হয় তা। এই নিষ্কাম কর্ম যিনি করেন, তিনি এক সময় মুক্তি বা মোক্ষলাভ করেন। জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে মুক্তি পেয়ে পরম ব্রহ্মের সঙ্গে চিরতরে লীন হয়ে যান। এই চিরমুক্তি বা মোক্ষলাভই হিন্দুধর্মের মূল লক্ষ্য।

যাঁরা মোক্ষলাভ করতে চান, তাঁরা কখনো অপরের ক্ষতি করেন না। তাঁরা কাউকে হিংসা করেন না। কারো বিরুদ্ধে তাঁদের কোনো বিদ্বেষ থাকে না। ব্রহ্মজ্ঞানে তাঁরা সবাইকে ভালোবাসেন। নিজের ক্ষতি হলেও অপরের উপকার করেন। সবাইকে আপনার মনে করেন। তাঁদের কোনো লোভ-মোহ থাকে না। ফলে জগতে কোনো দ্বন্দ্ব থাকে না। মারা-মারি, হানা-হানি থাকে না। সর্বত্র অখণ্ড শান্তি বিরাজ করে। এতে জগতের সার্বিক কল্যাণ সাধিত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ : শিক্ষার্থী দৈনন্দিন জীবনে অনুসরণীয় নিত্যকর্মের একটি তালিকা তৈরি করবে এবং সে তালিকা পড়ার টেবিলের সামনে টাঙিয়ে রাখবে, যাতে সবসময় চোখে পড়ে এবং অনুসরণ করতে পারে।

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। ______ বিষয়বস্তু হচ্ছে ব্রহ্ম।
২। পৌরাণিক যুগে অনেক নতুন ______ আবির্ভাব ঘটে।
৩। প্রতিদিন নিয়ম মেনে যে কাজ করা হয় তাকে বলে ______ ।

৪। নিত্যকর্মের ফলে ______ শেখা যায়।
৫। ______ রোগ, শোক, জরা, ব্যাধি কিছুই নেই।
৬। যাঁরা মোক্ষলাভ করতে চান তাঁরা ______ সবাইকে ভালোবাসেন।

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। হিন্দুধর্মের আরেক নাম	লীন হয়।
২। বৈদিক দেব-দেবীরা ছিলেন	সনাতন ধর্ম।
৩। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, কালী প্রভৃতি	নিরাকার।
৪। নিত্যকর্মের ফলে যে কোনো কাজে পুরোপুরি	পৌরাণিক দেবতা।
৫। আত্মার জীর্ণদেহ ত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করাকে বলে	মনোযোগ দেওয়া যায়।
	নবজন্ম।
৬। অর্জিত পুণ্য শেষ হলে জীবকে	পুনর্জন্ম লাভ করতে হয়।
৭। জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে মুক্তি পেয়ে জীব পরম ব্রহ্মে	জন্মান্তর।
	অশেষ ক্ষমতাধর।

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। 'স'- এর স্থলে 'হ' উচ্চারণ করতেন কারা?

ক. পারসিকরা খ. গ্রিকরা
গ. আফগানরা ঘ. তুর্কিরা

২। আত্মারূপে সকল জীবের মধ্যে কে বিরাজমান?

ক. দেবতা খ. জীবন
গ. ব্রহ্ম ঘ. দেবী

৩। বৈদিক যুগে প্রধান ধর্মীয় ক্রিয়া-কর্ম কী ছিল?

ক. নামকীর্তন খ. যাগ-যজ্ঞ
গ. পূজা-পার্বণ ঘ. জীবসেবা

৪। রাত্রিকৃত্যে কী বলে ঘুমাতে যেতে হয়?

ক. জগদীশ্বর খ. নারায়ণ
গ. বিষ্ণু ঘ. পদ্মনাভ

৫। আত্মার নতুন দেহ ধারণ করাকে কী বলে?

ক. জন্মান্তর   খ. নবজন্ম
গ. ইহজন্ম   ঘ. পরজন্ম

৬। ইন্দ্রের রাজধানীর নাম কী?

ক. দেবলোক   খ. সুরলোক
গ. অমরাবতী   ঘ. অমরলোক

৭। হিন্দুধর্মের মূল লক্ষ্য কী?

ক. ভোগ   খ. ত্যাগ
গ. স্বর্গলাভ   ঘ. মোক্ষলাভ

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। 'সনাতন' শব্দের অর্থ কী?
২। চারজন বৈদিক দেবতার নাম লেখ।
৩। নিত্যকর্ম কয়প্রকার ও কী কী?
৪। জন্মান্তর কাকে বলে?
৫। ভালো কাজ কী? তার ফলে কী হয়?
৬। মোক্ষ কাকে বলে?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। হিন্দুধর্মের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
২। বেদের কয়টি কাণ্ড? এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
৩। পৌরাণিক যুগের হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বর্ণনা কর।
৪। নিত্যকর্ম কী? যে কোনো তিনটি নিত্যকর্মের বর্ণনা দাও।
৫। জন্মান্তর কাকে বলে? এ সম্পর্কে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।
৬। পাপ-পুণ্য ও স্বর্গ-নরক বলতে কী বোঝ?
৭। মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ধর্মগ্রন্থ

আমরা জানি যে, ধর্মগ্রন্থে থাকে ধর্মের কথা। ঈশ্বরের কথা। দেব-দেবীর উপাখ্যান। সমাজ ও জীবন সম্পর্কে নানা উপদেশ। তাই ধর্মগ্রন্থ পাঠ করলে আমাদের কল্যাণ হয়।

হিন্দুদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বেদ বা বেদসংহিতা। এছাড়া আছে উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি। এর আগে আমরা রামায়ণ ও মহাভারত সম্পর্কে জেনেছি। এখন জানব বেদসংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ, পুরাণ ও গীতা সম্পর্কে।

বেদসংহিতা : বেদ ঈশ্বরের বাণী। বিভিন্ন মুনি-ঋষি এই বাণীসমূহ দর্শন করেছেন। সেগুলো লিপিবদ্ধ করে সংহত করেছেন। তাই এর নাম হয়েছে সংহিতা বা বেদসংহিতা।

বেদ প্রথমে একটিই ছিল। পরে ব্যাসদেব এর মন্ত্রগুলোকে চার ভাগে ভাগ করেন। ফলে বেদ হয়ে যায় চারটি। চারটি বেদ হলো : ঋগ্বেদ সংহিতা, যজুর্বেদ সংহিতা, সামবেদ সংহিতা ও অথর্ববেদ সংহিতা।

ঋগ্বেদ সংহিতা — এতে রয়েছে দেবতাদের স্তুতি ও প্রার্থনামূলক মন্ত্র। এগুলো পদ্যে রচিত এক ধরনের কবিতা।

যজুর্বেদ সংহিতা — এতে যে মন্ত্রগুলো রয়েছে সেগুলো যজ্ঞের সময় উচ্চারণ করা হয়।

সামবেদ সংহিতা — এর মন্ত্রগুলো গানের মতো। দেবতাদের উদ্দেশে এগুলো সুর দিয়ে গাওয়া হয়।

অথর্ববেদ সংহিতা — এতে চিকিৎসা বিজ্ঞান, বাস্তুবিদ্যা (গৃহ নির্মাণ) ইত্যাদিসহ জীবনের অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

বেদের এক নাম শ্রুতি। এর কারণ, অতীতে শিষ্যরা গুরুর কাছ থেকে শুনে শুনে বেদ মনে রাখতেন। তাই এর এক নাম হয়েছে শ্রুতি। বেদের দুটি অংশ — মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ।

মন্ত্র : বেদের যে অংশে পদ্যে রচিত এবং বিভিন্ন দেবতার প্রশংসা, স্তুতি ও প্রার্থনা করা হয়েছে, তাকেই **মন্ত্র** বলা হয়েছে। যেমন– ঋগ্বেদের শ্লোকসমূহ।

ব্রাহ্মণ : যে অংশে মন্ত্রের ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং যজ্ঞে মন্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, তাকে বলে ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ গদ্যে রচিত। ঐতরেয়, কৌষীতকি, শতপথ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ব্রাহ্মণ গ্রন্থ।

আরণ্যক : যা অরণ্যে রচিত তা আরণ্যক। এর বিষয় ধর্ম-দর্শন। এতে যজ্ঞের চেয়ে সৃষ্টির রহস্য, সৃষ্টির উৎস প্রভৃতি আধ্যাত্মিক বিষয় বেশি আলোচিত হয়েছে। ঐতরেয়, কৌষীতকি, শতপথ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য আরণ্যক।

উপনিষদ : এর আলোচ্য বিষয় ব্রহ্ম। ব্রহ্মের আরেক নাম পরমাত্মা। তিনি নিরাকার। প্রত্যেক জীবের মধ্যে তিনি বর্তমান। তাকে বলে জীবাত্মা। এ অর্থে জীবও ব্রহ্ম। ব্রহ্মই সবকিছুর মূলে। তাই উপনিষদে ব্রহ্ম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ঈশ, কেন, শ্বেতাশ্বতর, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য উপনিষদ।

পুরাণ : 'পুরাণ' শব্দটির সাধারণ অর্থ প্রাচীন। কিন্তু এখানে শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। যে ধর্মগ্রন্থে সৃষ্টি ও দেবতার উপাখ্যান, ঋষি ও রাজাদের বংশ-পরিচয় প্রভৃতি আলোচনা করা হয়েছে, তাকে বলে পুরাণ। এসবের মাধ্যমে বেদভিত্তিক হিন্দুধর্ম ও সমাজের নানা কথা বলা হয়েছে।

পুরাণ একটি নয়, অনেকগুলো। মূল পুরাণ ১৮টি। উপপুরাণ ১৮টি। এগুলোর রচয়িতা ব্যাসদেব। কয়েকটি মূল পুরাণ হলো — ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, শিবপুরাণ, অগ্নিপুরাণ ইত্যাদি। আর কয়েকটি উপপুরাণ হলো — নরসিংহপুরাণ, কালিকাপুরাণ, দেবীপুরাণ ইত্যাদি।

পুরাণের মধ্যে তিনজন দেবতার মাহাত্ম্য প্রধানভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁরা হলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। দুর্গা ও কালীর বর্ণনা আছে যথাক্রমে দেবীপুরাণ ও কালিকাপুরাণে।

গীতা : গীতার পুরো নাম শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। এটি মহাভারতের ভীষ্মপর্বের একটি অংশ। এতে ১৮টি অধ্যায় আছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রাক্কালে বিপক্ষে আত্মীয়-স্বজনদের দেখে অর্জুন যুদ্ধ করতে চাইলেন না। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে অনেক উপদেশ দেন। সেটাই গীতা। গুরুত্বের কারণে এটি পৃথক গ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে।

গীতায় সব রকমের দুর্বলতা পরিহার করতে বলা হয়েছে। ঈশ্বরের নামে সকল কর্ম করতে বলা হয়েছে। ফলের আশা না করে। একেই বলে নিষ্কাম কর্ম। আত্মার অমরত্বের কথা বলা হয়েছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বার কথা বলা হয়েছে। শ্রদ্ধাবান ও সংযমীরাই জ্ঞান লাভ করেন — একথা বলা হয়েছে। গীতা হচ্ছে সব শাস্ত্রের সার। তাই এটি হিন্দুদের একখানা অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ।

আমাদের ধর্মগ্রন্থসমূহে অনেক উপাখ্যান আছে। সেসব উপাখ্যানের মাধ্যমে ধর্ম, দর্শন, নৈতিকতা, ভক্তি, শ্রদ্ধা ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এখানে ভাগবতপুরাণ থেকে হরিভক্ত ধ্রুবের উপাখ্যানটি তুলে ধরা হলো :

হরিভক্ত ধ্রুব

অনেক কাল আগের কথা। উত্তানপাদ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর ছিলেন দুই রানি — সুনীতি ও সুরুচি। সুনীতি বড়, সুরুচি ছোট। সুনীতির পুত্র ধ্রুব, সুরুচির পুত্র উত্তম। ছোট রানি সুরুচি ছিলেন রাজার প্রিয়। তাই তাঁর পুত্র উত্তম পিতার কাছে বেশি আদর পেত।

একদিন উত্তম পিতার কোলে বসে আছে। তা দেখে ধ্রুবও পিতার কোলে উঠতে যায়। ঠিক তখনই সুরুচি এসে বাধা দেন। এতে ধ্রুব খুব কষ্ট পেল। সে কাঁদতে কাঁদতে মায়ের কাছে গিয়ে সব বলে দিল। মা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'কেঁদো না। হরিকে ডাক। তিনি তোমার সকল কষ্ট দূর করে দেবেন।'

ধ্রুব মাকে খুব শ্রদ্ধা করত। তাই মায়ের আদেশ অনুযায়ী সে হরিকে ডাকতে লাগল। একদিন সে সবার অলক্ষ্যে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেল। পথে যাকে দেখে তাকেই হরির কথা জিজ্ঞেস করে। এভাবে হরিনাম করতে করতে সে এক গভীর বনে ঢুকে পড়ল। তার মুখে হরিনাম শুনে বনের পশুরাও হিংসা ভুলে গেল।

ধ্রুব একমনে হরিকে ডেকেই চলেছে। অন্য কোনো দিকে তার কোনো খেয়াল নেই। তার একমাত্র লক্ষ্য শ্রীহরির সাক্ষাৎ লাভ করা।

বালক ধ্রুবের এই একাগ্রতা দেখে শ্রীহরির মন গলে গেল। তিনি ধ্রুবের কাছে এসে দেখা দিলেন। বললেন, 'ধ্রুব, তোমার তপস্যায় আমি মুগ্ধ হয়েছি। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। তুমি বাড়ি ফিরে যাও।'

ধ্রুব ভক্তিভরে শ্রীহরিকে প্রণাম করল। শ্রীহরি বৈকুণ্ঠে ফিরে গেলেন। ধ্রুবও বাড়ি ফিরল। রাজা উত্তানপাদ দুহাত বাড়িয়ে তাকে কোলে নিলেন। বড় হলে ধ্রুবকেই তিনি রাজা করলেন। মৃত্যুর পর ধ্রুবের স্থান হলো ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ স্থান ধ্রুবলোকে।

ধ্রুব উপাখ্যান থেকে আমরা এই নৈতিক শিক্ষা পাই যে, পিতা-মাতাকে শ্রদ্ধা করতে হবে। কারো সঙ্গে বিবাদ করা উচিত নয়। ভগবানকে ভক্তি করতে হবে। কোনো কিছু চাইলে একাগ্র মনে চাইতে হবে। তাহলে নিশ্চয়ই তা লাভ করা যাবে। এ শিক্ষা আমরা সবসময় মনে রাখব এবং জীবনে পালন করব।

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। বিভিন্ন মুনি-ঋষি ______ বাণীসমূহ দর্শন করেছেন।
২। ______ শুধু ব্রহ্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।
৩। ______ বেদভিত্তিক হিন্দুধর্ম ও সমাজের নানা কথা বলা হয়েছে।
৪। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা মহাভারতের ______ একটি অংশ।
৫। ______ শুনে বনের পশুরাও হিংসা ভুলে গেল।

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। বেদের এক নাম	দেবী পুরাণে।
২। বৃহদারণ্যক একটি	কথা বলা হয়েছে।
৩। দুর্গার বর্ণনা আছে	আত্মার।
৪। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় অমরত্বের	শ্রীহরির সাক্ষাৎ লাভ।
৫। ধ্রুবের একমাত্র লক্ষ্য ছিল	উপনিষদ।
	শ্রুতি।
	যোদ্ধার।

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। বেদ কয়খানা?

ক. তিন   খ. চার
গ. পাঁচ   ঘ. ছয়

২। বেদের যে অংশে মন্ত্রের ব্যাখ্যা করা হয়েছে তাকে কী বলে?

ক. ব্রাহ্মণ   খ. উপনিষদ
গ. আরণ্যক   ঘ. সংহিতা

৩। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মাহাত্ম্য কোথায় প্রাধান্য পেয়েছে?

ক. বেদে   খ. রামায়ণে
গ. পুরাণে   ঘ. মহাভারতে

৪। ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্মকে কী বলে?

ক. সকাম কর্ম　　　খ. সুকর্ম
গ. দুষ্কর্ম　　　ঘ. নিষ্কাম কর্ম

৫। মায়ের কথায় ধ্রুব কার শরণ নিয়েছেন?

ক. হরির　　　খ. কৃষ্ণের
গ. রামের　　　ঘ. শিবের

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। বেদের এক নাম শ্রুতি হলো কেন?
২। আরণ্যক কী? দুটি আরণ্যকের নাম লেখ।
৩। মূল পুরাণ কয়খানা? দুটি মূল পুরাণের নাম লেখ।
৪। গীতা কী?
৫। উত্তানপাদের কয়জন স্ত্রী ছিলেন? তাঁদের নাম লেখ।

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। চার বেদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
২। ব্রাহ্মণ কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
৩। উপনিষদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
৪। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
৫। ধ্রুব কীভাবে হরিকে পেল?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারী

জগতে বিভিন্ন ধরনের মানুষ জন্মগ্রহণ করেন। কেউ নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। কেউবা অপরের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেন। এঁরা হন নির্মোহ। পরের কল্যাণ, জগতের কল্যাণই এঁদের একমাত্র লক্ষ্য। আজীবন এঁরা মানুষ তথা জগতের উপকার করে যান। এঁরাই হলেন মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারী। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণিতে আমরা এমনি কয়েকজন মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারীর জীবনী পড়েছি। এই শ্রেণিতে আমরা স্বামী প্রণবানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার জীবনী পড়ব।

স্বামী প্রণবানন্দ

মাদারীপুর জেলার বাজিতপুর গ্রামে ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারি স্বামী প্রণবানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বিষ্ণুচরণ ভূঁইয়া, মাতা সারদা দেবী। তাঁদের চার পুত্র ও দুই কন্যা ছিল। প্রণবানন্দ তাঁদের তৃতীয় সন্তান। তাঁর প্রকৃত নাম বিনোদ। বিনোদের পিতা বিষ্ণুচরণ রাজা সূর্যকান্ত রায়ের অধীনে বাজিতপুর জমিদারির নায়েবের পদে চাকরি করতেন।

বিনোদ ছোটবেলা থেকেই ছিলেন শিবের ভক্ত। তখন থেকেই তিনি ওঙ্কার সাধনার অভ্যাস করেন।

বিনোদ বাজিতপুর গ্রামের উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতেন। তখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়েছে। বিনোদের উপর তার প্রভাব পড়ে। তিনি পড়াশুনায় মন দিতে পারেন না। তারপরও ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন।

তখন গ্রামে-গঞ্জে হরি সংকীর্তনের প্রচলন ছিল খুব বেশি। বিনোদ কীর্তন খুব পছন্দ করতেন। তাই তিনি বন্ধুদের নিয়ে একটি কীর্তন দল গঠন করেন।

বিনোদ নিজে ছিলেন খুব সংযমী ও পরিশ্রমী। তাই বন্ধুদেরও তিনি সংযম ও ব্রহ্মচর্য পালনের আহ্বান জানান। বিনোদ তাদের নিয়ে আশ্রম গড়ে তোলেন। বাজিতপুরে এই আশ্রম খুব পরিচিত হয়ে ওঠে। আর বিনোদের পরিচয় হয় তপস্বী ব্রহ্মচারী হিসেবে।

২০২৫

তখন স্বদেশী আন্দোলন খুব জোরদার হয়ে উঠেছে। মাদারীপুর ছিল বিপ্লবীদের একটি বিখ্যাত কেন্দ্র। বিপ্লবী পূর্ণদাস ছিলেন এ অঞ্চলের নেতা। তিনি বিনোদের সংগঠনশক্তির কথা শুনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। বিনোদও এগিয়ে আসেন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংঘবদ্ধ করার জন্য। ঢাকা, বরিশাল, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলা থেকে বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত ছেলেরা আসতে থাকে বিনোদের আশ্রমে। ক্রমে ব্যাপারটি চারদিকে প্রচারিত হয়ে যায়। তাই ব্রিটিশ পুলিশ একদিন বিনোদকে গ্রেফতার করে। পরে অবশ্য কোনো প্রমাণ না পেয়ে ছেড়ে দেয়।

এর কিছুদিন পরে বিনোদের পিতার মৃত্যু ঘটে। মায়ের আদেশে তিনি যান গয়াধামে পিণ্ড দিতে। কিন্তু সেখানে তীর্থযাত্রীদের উপর পান্ডাদের অত্যাচার দেখে তিনি ক্ষুব্ধ হন। তিনি সংকল্প করেন হিন্দুদের তীর্থসমূহ সংস্কার করা হবে তাঁর প্রথম ও প্রধান কাজ। এর জন্য সংঘশক্তি প্রয়োজন।

গ্রামে ফিরে বিনোদ মাদারীপুর, বাজিতপুর, খুলনা প্রভৃতি স্থানে সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এসবের মাধ্যমে গরিব-দুঃখী, আর্ত-পীড়িতদের সেবা দিতে থাকেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দুঃসময়ে তিনি সেবাশ্রমের কর্মীদের নিয়ে মানুষের সেবা করে চলেন। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে সুন্দরবন অঞ্চলে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। বিনোদ পাঁচশত কর্মী নিয়ে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের মধ্যে খাবার বিতরণ করেন। তাঁর এ কাজে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় খুবই খুশি হন এবং তাঁর উচ্চ প্রশংসা করেন।

১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে প্রয়াগে অর্ধকুম্ভ মেলা বসে। বিনোদ সেখানে যান। তাঁর সঙ্গে দেখা হয় স্বামী গোবিন্দানন্দ গিরি মহারাজের। বিনোদ তাঁর নিকট সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা নেন। তখন তাঁর নতুন নাম হয় স্বামী প্রণবানন্দ। এ সময় তিনি গৈরিক বেশ ধারণ করেন।

এবার স্বামী প্রণবানন্দ দৃষ্টি দিলেন তীর্থভূমির দিকে। তীর্থসমূহের পবিত্রতা ফিরিয়ে আনতে হবে। তীর্থযাত্রীরা যাতে তীর্থে গিয়ে স্বচ্ছন্দে পুণ্যকর্ম করতে পারেন, তার ব্যবস্থা করতে হবে। গয়ায় পান্ডাদের অত্যাচারের কথা তিনি আগেই জানতেন। তাই সেখানেই তিনি আগে গেলেন। প্রতিষ্ঠা করলেন সেবাশ্রম। এই সেবাশ্রমই পরবর্তীকালে 'ভারত সেবাশ্রম' নামে সারা ভারতে খ্যাতি লাভ করে।

প্রণবানন্দের এ কাজে অনেক বাধা এসেছিল। কিন্তু সব বাধা উপেক্ষা করে তিনি এগিয়ে চলেন। পর্যায়ক্রমে তিনি কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানে ভারত সেবাশ্রম

২০২৫

প্রতিষ্ঠা করেন। এর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার সেবা প্রদান করতে থাকেন। তীর্থযাত্রীরা যাতে নির্বিঘ্নে তাঁদের ক্রিয়া-কর্ম করতে পারেন, তার ব্যবস্থা করেন। এর ফলে তীর্থস্থানসমূহের চেহারা পাল্টে যায়।

স্বামী প্রণবানন্দ

স্বামী প্রণবানন্দ অস্পৃশ্যতাকে ঘৃণা করতেন। তিনি শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভাব জাগিয়ে তোলার কথা বলতেন। সকলের মধ্যে সহযোগিতার ভাব গড়ে তোলার কথা বলতেন। এজন্য মিলন-মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা বলতেন। তিনি তাঁর অনুসারীদের বলতেন : তোমরা সনাতন আদর্শে সংগঠিত হয়ে আর্য ঋষিদের আসনে উপবেশনপূর্বক এই অধঃপতিত দেশকে নীতি ও ধর্মের পথে চালিত করবে। আহারে, বিহারে ও আলাপে সংযম অভ্যাস করবে। দুর্বল ব্যক্তি আত্মজ্ঞান ও ভগবদ্ভক্তি লাভ করতে পারে না। সংঘ, সংঘশক্তি ও সংঘনেতা — এই তিনে মিলে হয় এক।

২০২৫ স্বামী প্রণবানন্দ ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে বাজিতপুর আশ্রমে এক হিন্দু মহাসম্মেলনের আয়োজন

করেন। তাতে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম ঘটে। তারা স্বামীজীর বাণী শুনে নবজীবনের সন্ধান পায়। লক্ষ লক্ষ অনুন্নত শ্রেণির মানুষ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে মানসিক হীনম্মন্যতা থেকে মুক্তি লাভ করে।

মহাপুরুষ স্বামী প্রণবানন্দ মাত্র ৪৪ বছর ১১ মাস ৯ দিন বেঁচে ছিলেন। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ৮ই জানুয়ারি কলকাতার বালিগঞ্জের ভারত সেবাশ্রম সংঘের বাড়িতে তিনি দেহত্যাগ করেন।

ভগিনী নিবেদিতা

ভগিনী নিবেদিতা ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দে ইউরোপের আয়ারল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল। তাঁর পিতা স্যামুয়েল ছিলেন একজন ধর্মপ্রচারক আদর্শবাদী মানুষ। তার মাতা মেরী ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণা নারী। পিতা-মাতার এসব গুণ মার্গারেটের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। তাই বাল্যকাল থেকেই তাঁর মধ্যে আদর্শ, নিষ্ঠা ও ধর্মপ্রবণতা লক্ষ করা যায়।

মার্গারেট শৈশবে পিতৃহীন হন। তাঁর পিতা মাত্র ৩৪ বছর বয়সে মারা যান। মার্গারেটের আরও এক বোন ও এক ভাই ছিলেন। মা মেরী তাঁদের সবাইকে নিয়ে পিতা হ্যামিলটনের বাড়িতে আশ্রয় নেন। সেখানেই মার্গারেটের পড়াশোনা শুরু হয়।

মার্গারেট খুব প্রতিভার অধিকারিণী ছিলেন। স্কুল-কলেজের পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দেন। কলেজের পরীক্ষা শেষ করে তিনি একটি স্কুলে শিক্ষকতার কাজ নেন। অবসর সময়ে একটি চার্চের কর্মী হিসেবে জনসেবা করতেন। এর মধ্য দিয়ে অল্প বয়সেই তাঁর মধ্যে সেবার মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু একটি বিষয়ে চার্চের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মার্গারেটের মতবিরোধ দেখা দেয়। চার্চের নিয়ম ছিল যারা চার্চে এসে উপাসনা করবে, কেবল তারাই চার্চের সাহায্য পাবে। মার্গারেট এটা মানতে পারেননি। তাঁর মতে দুঃস্থ, নিপীড়িত সবাই চার্চের সুযোগ সুবিধা পাবে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তা মানেননি। তাই মার্গারেট মনে মনে খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। তিনি এই সংকীর্ণতা থেকে উদ্ধারের একটা পথ খুঁজছিলেন। এমন সময় তাঁর সাক্ষাৎ হয় স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে।

১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার শিকাগো ধর্ম সম্মেলনে বক্তৃতা দিয়ে বিবেকানন্দ তখন

বিশ্বখ্যাত। বিভিন্ন জায়গায় তিনি বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন। ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি লন্ডন আসেন। সেখানকার দার্শনিক ও ধর্মানুরাগীরা হিন্দুধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে বক্তৃতা শোনার জন্য তাঁর নিকট ছুটে আসেন। একদিন মার্গারেটও এলেন। তিনি স্বামীজীর বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হন। বেদান্তের ধর্মমত তাঁকে শান্তি দেয়। তিনি স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

ভগিনী নিবেদিতা

শুরু হয় মার্গারেটের নতুন জীবন। ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইংল্যান্ড থেকে ভারতে চলে আসেন। স্বামীজী তখন ধর্মে-কর্মে ভারতকে নতুন চেতনা দানের মহান ব্রত গ্রহণ করেছেন। মার্গারেট মনেপ্রাণে গুরুর কাজে সাহায্য করতে লাগলেন। কাজের প্রতি তাঁর আত্মনিবেদন দেখে স্বামীজী তাঁর নাম দেন 'নিবেদিতা'। স্বামীজীর শিষ্যরা তাঁকে বলতেন 'ভগিনী নিবেদিতা'। সেই থেকে মার্গারেট 'ভগিনী নিবেদিতা' নামেই খ্যাত হন।

একজন বিদেশিনী হয়েও নিবেদিতা ভারতবাসীদের একান্ত আপন করে নিয়েছিলেন। ভারতবাসীদের সেবায় তিনি তাঁর সমস্ত ভালোবাসা উজাড় করে দিয়েছিলেন। গুরুর নির্দেশে তিনি কলকাতার বাগবাজারে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁর শিক্ষা-পদ্ধতি ছিল চিত্তাকর্ষক। তিনি গল্পের ছলে ছাত্রীদের শিক্ষা দিতেন। রামায়ণ-মহাভারত থেকে সীতা, সাবিত্রী, গান্ধারী প্রভৃতি মহীয়সী নারীদের জীবনী খুব যত্নসহকারে তাদের শেখাতেন। এছাড়া নানাভাবে তিনি এদেশের গরিব-দুঃখীদের সেবা করতেন।

২০২৫

ভারতকে ভগিনী নিবেদিতা 'ধাত্রী দেবতা' রূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাই পরাধীন ভারতের দুঃখ, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুসংস্কার দেখে তাঁর প্রাণ কেঁদে ওঠে। তিনি ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের কথা ভাবতে থাকেন। তখন ভারতের মুক্তির জন্য যাঁরা সংগ্রাম করতেন, তিনি তাঁদের উৎসাহ দিতেন এবং সাহায্য করতেন। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে বারাণসীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসে তিনি বিলেতি দ্রব্য বর্জনের জোরালো আহ্বান জানান। ভারত ও তার জনগণের জন্য তাঁর এই মমতা দেখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'লোকমাতা।'

ব্যক্তিজীবনে নিবেদিতা ছিলেন ভারতীয় নারী-জীবনের প্রতীক। তিনি নিষ্ঠাবতী ব্রহ্মচারিণীরূপে জীবনযাপন করতেন। তাঁর লেখা 'কালী, দ্য মাদার', 'দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' প্রভৃতি গ্রন্থে ভারতের প্রতি তাঁর অনুরাগ ও গুরুর প্রতি শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়।

নিচের ছকটি পূরণ করি :

১। মার্গারেট এলিজাবেথের নাম হয়	
২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মার্গারেটের নাম দিয়েছিলেন	

নিবেদিতা দেশের কাজ ও গ্রন্থ রচনায় কঠোর পরিশ্রম করতেন। ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য তিনি দার্জিলিং যান। সেখানেই ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে এই মহীয়সী নারীর জীবনাবসান ঘটে। তাঁর স্মৃতিস্তম্ভে লেখা আছে :

এখানে ভগিনী নিবেদিতা শান্তিতে নিদ্রিতা –
যিনি ভারতবর্ষকে সর্বস্ব অর্পণ করেছেন।

ভগিনী নিবেদিতার জীবনী থেকে আমরা এই নৈতিক শিক্ষা পাই যে, যাঁরা মহীয়সী নারী তাঁরা জাতি, ধর্ম, বর্ণ সবকিছুর উর্ধ্বে। মানব সেবার জন্য তাঁদের জন্ম। তাই তাঁরা শুধু দেশের গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকেন না। গোটা বিশ্বই তাঁদের দেশ। সকল মানুষই তাঁদের আপন। মানব সেবাই হচ্ছে তাঁদের মূল লক্ষ্য।

আমরা এই শিক্ষা সর্বদা মনে রাখব এবং আমাদের জীবনে অনুসরণ করার চেষ্টা করব।

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। যাঁরা আজীবন জগতের উপকার করে যান, তাঁরাই হলেন ______ ও মহীয়সী নারী।

২। মাদারীপুর ছিল ______ একটি বিখ্যাত কেন্দ্র।

৩। স্বামী প্রণবানন্দ প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের নাম ______ ।

৪। মার্গারেটকে শান্তি দেয় ______ ধর্মমত।

৫। রবীন্দ্রনাথ মার্গারেটের নাম দিয়েছিলেন ______ ।

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারীদের	সংযমী ও পরিশ্রমী।
২। বিনোদ ছিলেন খুবই	একমাত্র লক্ষ্য জগতের কল্যাণ।
৩। স্বামী প্রণবানন্দ	একজন ধর্মপ্রচারক।
৪। মার্গারেটের পিতা স্যামুয়েল ছিলেন	অস্পৃশ্যতাকে ঘৃণা করতেন।
৫। ভগিনী নিবেদিতা দার্জিলিং যান	জীবনী সুন্দর।
	সাহসী ও শক্তিমান।
	স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য।

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। স্বামী প্রণবানন্দের প্রকৃত নাম কী?

ক. বিনোদ　　খ. আনন্দ

গ. সদানন্দ　　ঘ. বিবেকানন্দ

২। বিনোদের সেবাকাজে খুশি হয়ে কে প্রশংসা করেছিলেন?

ক. আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু　　খ. বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু

গ. আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়　　ঘ. কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০১৫

৩। ভগিনী নিবেদিতার জন্মস্থান কোথায়?

ক. স্কটল্যান্ডে　　খ. আয়ারল্যান্ডে
গ. লন্ডনে　　ঘ. সুইজারল্যান্ডে

৪। বিবেকানন্দ কত খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে আসেন?

ক. ১৮৯৩　　খ. ১৮৯৪
গ. ১৮৯৫　　ঘ. ১৮৯৬

৫। নিবেদিতার মৃত্যু হয় কোথায়?

ক. কলকাতায়　　খ. বেলুড়ে
গ. দক্ষিণেশ্বরে　　ঘ. দার্জিলিং-এ

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। বিনোদের পিতা বিষ্ণুচরণ ভূঁইয়া কী করতেন?
২। বিনোদ কেমন ছিলেন? তিনি বন্ধুদের নিয়ে কী করেছিলেন?
৩। বিনোদের নাম 'স্বামী প্রণবানন্দ' হয় কখন এবং কীভাবে?
৪। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বিনোদের প্রশংসা করেছিলেন কেন?
৫। চার্চের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মার্গারেটের বিরোধ বাধে কেন?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। বিনোদকে কেন ব্রিটিশ পুলিশ গ্রেফতার করেছিল?
২। তীর্থস্থানে পান্ডাদের অত্যাচার বন্ধে বিনোদ কী করেছিলেন?
৩। বিবেকানন্দের সঙ্গে মার্গারেটের সাক্ষাৎ হয় কখন এবং কীভাবে?
৪। নারীশিক্ষার জন্য নিবেদিতা কী করেছিলেন?
৫। ভারতের স্বাধীনতার জন্য নিবেদিতা কী করেছিলেন?

চতুর্থ অধ্যায়

ঈশ্বরের একত্ব, ধর্মীয় সাম্য ও সম্প্রীতি

পৃথিবীর মানুষের মধ্যে নানা দিক থেকে মিল যেমন আছে, তেমনি আবার অনেক অমিলও আছে।

মিলের দিক থেকে যদি দেখি, তাহলে দেখব, সবাই মানুষ। সকলের মধ্যে রয়েছে একই মনুষ্যত্ব।

আবার বেশভূষা, চাল-চলন, গায়ের রং, ভাষা প্রভৃতি দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে।

ধর্মের দিক থেকেও পার্থক্য আছে। হিন্দুধর্মের পাশাপাশি, ইসলাম, বৌদ্ধ, খ্রিস্ট প্রভৃতি ধর্মের অনুসারীরা রয়েছেন। বিভিন্ন ধর্মের মত ও পথের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্য রয়েছে উপাসনার পদ্ধতিতে।

হিন্দুরা সৃষ্টিকর্তাকে ঈশ্বর বলেন। মুসলমানেরা বলেন আল্লাহ, খ্রিস্টানেরা বলেন গড। হিন্দুরা উপাসনালয়কে বলেন মন্দির, মুসলমানেরা বলেন মসজিদ, খ্রিস্টানেরা বলেন গির্জা। কিন্তু সবাই একই সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করেন। তাই ধর্মমত ও উপাসনা পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য থাকলেও ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। সকল ধর্মই নিজের মুক্তি এবং জীব ও জগতের মঙ্গল চায়।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পার্থকে (অর্জুন) বলেছেন,

> যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
> মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥
> (শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, ৪/১১)

অর্থাৎ যে আমাকে যেভাবে উপাসনা করে, আমি সেভাবেই তাকে সন্তুষ্ট করি। হে পার্থ (অর্জুন), মানুষ সকল প্রকারে আমার পথই অনুসরণ করে।

সুতরাং সাধনার পথ একটি নয়, বহু। এদিকে লক্ষ করে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন, 'যত মত, তত পথ'। উপাসনার পথ বিভিন্ন হলেও উপাস্য এক এবং অদ্বিতীয়।

নিচের ছকটি পূরণ করি :

১। উপাসনালয়কে হিন্দুরা বলেন	
২। উপাসনালয়কে খ্রিষ্টানেরা বলেন	
৩। যত মত,	

মানুষে মানুষে কোনো পার্থক্য করা উচিত নয়। সকলকে — সকল মত ও পথের মানুষকে সমতার দৃষ্টিতে দেখা উচিত। একেই বলে ধর্মীয় সাম্য।

ধর্মীয় সাম্য বজায় রাখলে তার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় সম্প্রীতি।

এ কথা মনে রেখে আমরা সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করব। সকল মানুষের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করব।

কে কোন ধর্মের, কোন জাতির, কোন বর্ণের আমরা তা বিচার করব না। আপদে-বিপদে, আনন্দ-উৎসবে আমরা সকলের সঙ্গে সম্প্রীতিপূর্ণ আচরণ করব। সকল ধর্মের মানুষকে আপন বলে ভাবব।

এভাবে ধর্মীয় সাম্য রক্ষা করে চলব। তাহলে সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে আমরা সকলে শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারব। তবেই মানুষে-মানুষে জেগে উঠবে মমত্ববোধ।

ঈশ্বরের একত্ব ও ধর্মীয় সাম্যে গভীর বিশ্বাস রেখে আমরা বলব —

'সবার উপরে মানুষ সত্য,
তাহার উপরে নাই।'

আমরা বলব, সকল ধর্মের মানুষ একে অপরের ভাই।

হিন্দুধর্ম বিশ্বাস করে যে, সকল জীবের মধ্যে আত্মারূপে ঈশ্বর অবস্থান করেন। আর এ বিশ্বাস ধর্মীয় সাম্যবোধ জাগ্রত করার প্রধান সহায়ক।

এ কথা মেনে চললে পৃথিবী হবে শান্তিময়–আনন্দময়।

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। সকল মানুষের মধ্যে রয়েছে ______।

২। মুসলমান ধর্মাবলম্বীরা উপাসনালয়কে বলেন ______।

৩। ধর্মীয় সাম্য আমাদের ______ করে।

৪। মানুষে-মানুষে কোনো ______ করা উচিত নয়।

৫। 'সবার উপরে ______ সত্য, তাহার উপরে নাই।'

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। ধর্মে-ধর্মে একটি পার্থক্য রয়েছে	গড।
২। খ্রিস্টানেরা ঈশ্বরকে বলেন	অদ্বিতীয়।
৩। ঈশ্বর এক এবং	উপাসনা পদ্ধতিতে।
৪। ধর্মে ধর্মে মত ও পথের বিভিন্নতা থাকলেও	ভালোবাসা প্রদর্শন করব।
৫। সকল মানুষের প্রতি	দল বেঁধে চলব।
	ঈশ্বর কিন্তু এক।

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। মানুষে-মানুষে মিলের একটি সূত্র হলো —

ক. টাকা-পয়সা খ. জনবল

গ. মনুষ্যত্ব ঘ. রাজত্ব

২। কার আরেকটি নাম পার্থ ?

ক. ভীমের খ. অর্জুনের

গ. নকুলের ঘ. সহদেবের

৩। পার্থকে কে উপদেশ দিয়েছিলেন ?

ক. যুধিষ্ঠির খ. দুর্যোধন

গ. শ্রীকৃষ্ণ ঘ. বলরাম

২০২৫

৪। সাধনার পথ —

ক. একটি　　খ. দুটি

গ. পাঁচটি　　ঘ. বহু

৫। 'যত মত, তত পথ' — কথাটি কে বলেছেন?

ক. বিবেকানন্দ　　খ. রামকৃষ্ণ

গ. সারদা দেবী　　ঘ. রানি রাসমণি

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। পৃথিবীতে প্রচলিত চারটি প্রধান ধর্মের নাম কী?

২। যে আমাকে যেভাবে উপাসনা করে আমি তাকে সেভাবেই সন্তুষ্ট করি — এ কথাটি কে এবং কাকে বলেছিলেন?

৩। ধর্মীয় সাম্য রক্ষা করে চললে কী প্রতিষ্ঠিত হবে?

৪। মানুষ মানুষকে কিসের দৃষ্টিতে দেখবে?

৫। বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা ঈশ্বরকে কী কী নামে ডাকে?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। সকল ধর্মের মূল কথা কী?

২। 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥' — ব্যাখ্যা কর।

৩। আমরা অন্য ধর্মের লোকদের সঙ্গে কেমন আচরণ করব?

৪। ধর্মীয় সাম্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা কী?

৫। 'সাধনার পথ বহু, কিন্তু ঈশ্বর এক।' — কথাটি বুঝিয়ে লেখ।

পঞ্চম অধ্যায়

শিষ্টাচার ও পরমতসহিষ্ণুতা

শিষ্টাচার

আমরা আমাদের কোনো শিক্ষকের সম্মুখীন হলে তাঁকে প্রণাম করি। অন্য কোনো গুরুজনের প্রতিও সম্মান জানাই। তাঁদের সঙ্গে শান্ত নরম গলায় কথা বলি। আবার সহপাঠী বা সমবয়সী বন্ধুদের কুশল জিজ্ঞাসা করি, 'কী খবর ? ভালো আছ তো ?' ছোটদের আদর করি। বড়দের সম্মান জানিয়ে চলা এবং বলা, সমবয়সীদের ও ছোটদের সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহার, এই যে নম্র-ভদ্র আচরণ একেই বলে শিষ্টাচার।

শিষ্ট কথাটির অর্থ 'ভদ্র'। 'আচার' মানে ব্যবহার। তাহলে শিষ্টাচার হলো — শিষ্ট যে আচার অর্থাৎ নম্র ও ভদ্র ব্যবহার। শিষ্টাচার একটি নৈতিক গুণ এবং ধর্মের অঙ্গ।

শিষ্টাচার আমাদের চরিত্রকে সুন্দর করে, উন্নত করে, পবিত্র করে। সজ্জন বা ধার্মিক ব্যক্তির চরিত্রের অন্যতম প্রধান গুণ এই শিষ্টাচার। শিষ্টাচারের দ্বারা মানুষের মন জয় করা যায়। এ গুণ থাকলে মানুষের ভালোবাসা পাওয়া যায়। বড়, সমবয়সী ও ছোটদের কাছ থেকে সম্মান পাওয়া যায়। আমরা যদি একে অন্যের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করি, তাহলে আমাদের সমাজও থাকবে শান্ত-সুন্দর।

আমরা জানি, জীবের মধ্যে আত্মারূপে ঈশ্বর বিরাজ করেন। তাই কারো প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন মানে ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন। এ কারণেও ছোট-বড় সকলের প্রতিই আমরা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি। আর এভাবেই শিষ্টাচার ধর্মের অঙ্গরূপে বিবেচিত হয়।

শিষ্টাচার প্রদর্শনের দুটি দৃষ্টান্ত দাও।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণও শিষ্টাচারের আদর্শ প্রকাশ করেছেন। তাঁর শিষ্টাচারের একটি কাহিনী বলছি।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শিষ্টাচার

আমরা জানি, ভগবান জীবের মঙ্গলের জন্য, ধর্ম বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য, দুষ্টের দমন করতে পৃথিবীতে নেমে আসেন। ভগবান এভাবে পৃথিবীতে অবতরণ করেন বা নেমে আসেন বলে তাকে অবতার বলা হয়।

দ্বাপর যুগে ভগবান স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণরূপে পৃথিবীতে নেমে এসেছিলেন। তাই তো বলা হয় 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।' — শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।

সে সময়ে চেদি নামক একটি দেশের রাজা ছিলেন শিশুপাল। শিশুপাল খুব দুষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। প্রজাদের উপর অত্যাচার করতেন। অন্য রাজাদের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে যুদ্ধ করতেন।

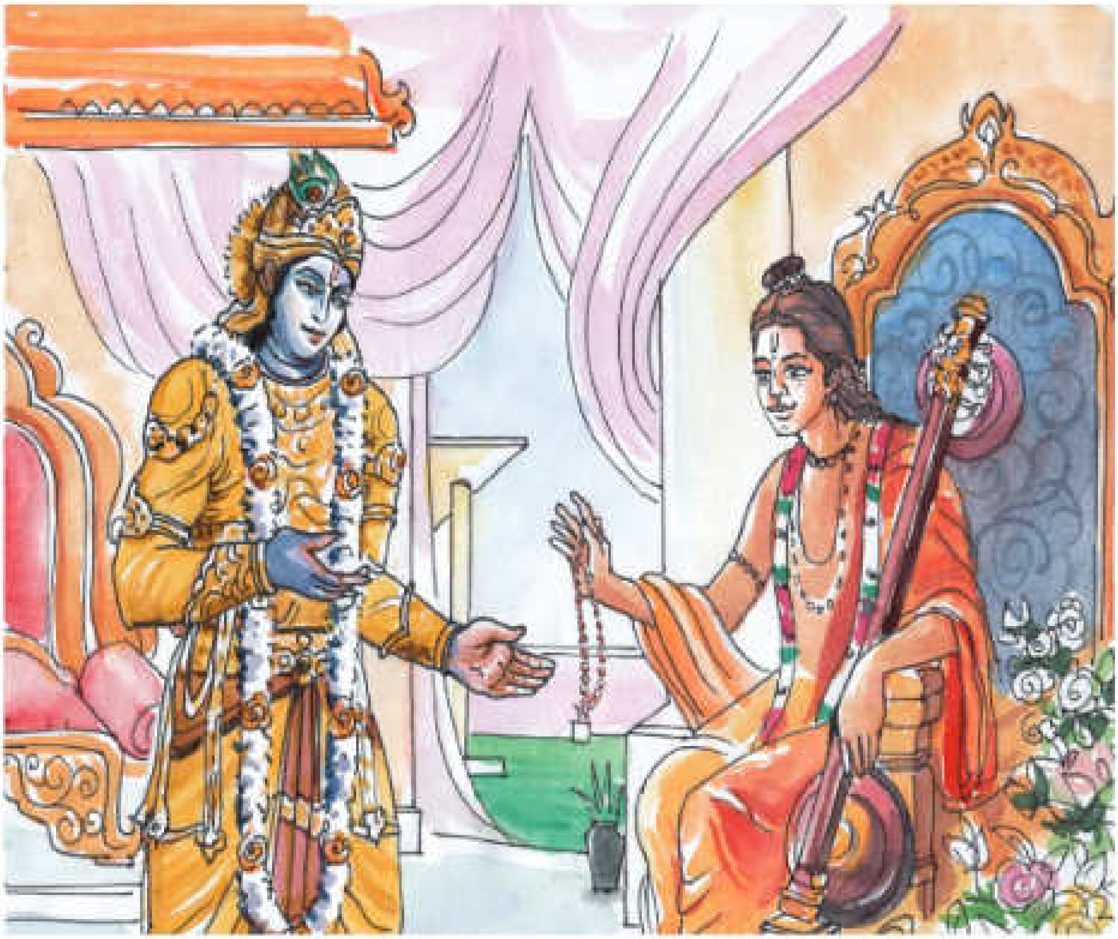

দেবর্ষি নারদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের শিষ্টাচার

তখন দেবরাজ ইন্দ্র পৃথিবীর শান্তি রক্ষার জন্য দেবর্ষি নারদকে পাঠালেন পৃথিবীতে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে। দয়াময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন মথুরায় পিতা বসুদেবের আলয়ে বাস করছিলেন।

স্বর্গ থেকে নেমে এলেন দেবর্ষি নারদ। হাতে তাঁর বীণা। সে বীণা বাজিয়ে তিনি ভগবানের গুণগান করেন। আর রয়েছে জপের জন্য অক্ষমালা।

নারদ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সামনে এলেন। উঠে দাঁড়ালেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাঁকে বসার আসন দিলেন। বসতে অনুরোধ জানালেন। নারদ না বসা পর্যন্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ আসনে বসলেন না।

তিনি নারদের কুশল জিজ্ঞেস করলেন। দেবতাদের কুশল জিজ্ঞেস করলেন, 'দেবতারা সবাই ভালো আছেন তো?' তারপর শান্ত কণ্ঠে বিনয়ের সঙ্গে নারদকে তাঁর আসার কারণ জিজ্ঞেস করলেন।

স্বয়ং ভগবান হয়েও শ্রীকৃষ্ণ নারদের প্রতি যে আচরণ করলেন, তার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে শিষ্টাচার।

আমরাও ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অনুসরণ করে মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারীদের জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে সকলের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করব। নম্রভাবে প্রশ্ন করব। ভদ্রভাবে প্রশ্নের উত্তর দেব। শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা, সমবয়সীদের সৌজন্য জানাব। আর ছোটদের স্নেহ করব। তাদের সঙ্গেও আমরা শিষ্ট আচরণ করব। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষদের অসুবিধাগুলো বিবেচনা করে তাদের সহায়তা করব। মনে রাখব শিষ্টাচার একদিনের নয়, প্রতিদিনের আচরণে থাকবে শিষ্টাচার। আমরা প্রতিনিয়ত করব শিষ্টাচারের অনুশীলন।

পরমতসহিষ্ণুতা

শ্যামল আর শামিমা সহপাঠী।

একদিন ওরা বইমেলায় গেছে বই কিনতে। বই কিনে বেরিয়ে এলো ওরা মেলা থেকে। একটু হাঁটতেই দেখে ফুটপাথের পাশে যে অস্থায়ী খাবার দোকানগুলো বসেছে, সেগুলোর একটার নাম 'এসো কিছু খাই'।

শ্যামল আর শামিমা সেখানে ঢুকল।

শ্যামল বলল, 'আইসক্রিম খাব।'

শামিমা বলল, 'না রে, একটু ঠান্ডা লেগেছে। আমি চা খাব।'

তখন শ্যামল বলল, 'ঠিক আছে, তুই চা খা, আমি আইসক্রিম খাই।'

শামিমা বলল, 'ঠিক আছে।'

তোমার নিজের জীবন থেকে অথবা তোমার জানা পরমতসহিষ্ণুতা প্রদর্শনের একটি ঘটনা বল।

এই যে নিজে নিজের মতে ঠিক থেকে অন্যের মতকেও মেনে নেওয়া, শ্রদ্ধা করা—একেই বলে পরমতসহিষ্ণুতা।

সবাই সব বিষয়ে একমত হবে, তা আশা করা যায় না। তাই অন্যের ভিন্ন মতকেও শ্রদ্ধা করতে হবে। হিন্দুধর্মের পাশাপাশি পৃথিবীতে আরও অনেক ধর্মমত আছে। যেমন — ইসলাম, বৌদ্ধধর্ম, খ্রিষ্টধর্ম ইত্যাদি। প্রতিটি ধর্মমতের নিজস্ব বিধিবিধান আছে, ধর্মচর্চার নিজস্ব পথ ও পদ্ধতি আছে। এক্ষেত্রে নিজের ধর্ম বা মতকে আমরা মানব, অন্য ধর্ম বা মতেরও স্বীকৃতি দেব। এর অন্যথা হলে সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়। সমাজে অশান্তির সৃষ্টি হয়।

রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রেও পরমতসহিষ্ণুতা প্রয়োজন। এর অন্যথায় রাষ্ট্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে না। ঐক্য বা সংহতির একটি সূত্র হচ্ছে পরমতসহিষ্ণুতা।

পরমতসহিষ্ণুতা প্রয়োজন এমন দুটি ক্ষেত্রের উল্লেখ কর।

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার শিকাগো শহরে এক ধর্মসভায় পরমতসহিষ্ণুতার আদর্শ তুলে ধরেছিলেন। সেই কাহিনীটি শোনাচ্ছি :

পরমতসহিষ্ণুতা ও স্বামী বিবেকানন্দ

১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দ, সেপ্টেম্বরের ১১ তারিখ। আমেরিকার শিকাগো শহরে এক ধর্ম মহাসভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

সেই ধর্ম মহাসভার প্রথম অধিবেশনের সভাপতি কার্ডিনাল গিবসন উপস্থিত শ্রোতাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন স্বামী বিবেকানন্দকে।

অভ্যর্থনার উত্তরে স্বামী বিবেকানন্দ তুলে ধরলেন পরমতসহিষ্ণুতার হিন্দুধর্মসম্মত আদর্শ।

যেখানে অনেকেই কেবল নিজ-নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ এবং জয়লাভে মুখর ছিলেন, সেখানে স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বলেন, 'যে ধর্ম অন্যকে চিরকাল পরমতসহিষ্ণুতার ও সর্ববিধ মত স্বীকার করার শিক্ষা দিয়ে আসছে, আমি সেই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত বলে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমরা শুধু সকল ধর্মকে সহ্য করি না, সকল ধর্মকেই সত্য বলে বিশ্বাস করি।'

তিনি শিবমহিম্নস্তোত্র থেকে উল্লেখ করলেন —

রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃঋজুকুটিলনানাপথজুষাং।
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব ॥

অর্থাৎ — বিভিন্ন নদীর উৎস বিভিন্ন স্থানে, কিন্তু তারা সকলেই একই সমুদ্রে তাদের জলরাশি ঢেলে দেয়। তেমনি নিজের রুচির বৈচিত্র্যের কারণে সোজা-বাঁকা নানা পথে যারা চলেছে, হে ঈশ্বর, তুমিই তাদের সকলের একমাত্র লক্ষ্য।

সভায় ধন্য ধন্য পড়ে গেল।

সবাই স্বামী বিবেকানন্দের মুখে পরমতসহিষ্ণুতার এ কথা শুনে মুগ্ধ হলেন।

তাই নিজের মতে স্থির থেকেও পরের মতকে শ্রদ্ধা করা যায়।

সুতরাং আমরাও পরমতসহিষ্ণুতাকে ধর্মের অঙ্গ বলে মানব। নিজেদের জীবনে, সমাজে ও রাষ্ট্রে পরমতসহিষ্ণুতার আদর্শ অনুসরণ করে চলব।

২০২৫

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। নম্র-ভদ্র আচরণকে ______ বলে।
২। শিষ্টাচার ধর্মের ______ ।
৩। নৈতিক গুণ হিসেবে শিষ্টাচার ______ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।
৪। অন্যের যুক্তিযুক্ত মতকে শ্রদ্ধা করা বা মেনে নেওয়াকে বলে ______ ।
৫। পরমতসহিষ্ণুতা সংহতির একটি ______ ।

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। আমরা শিক্ষককে	শিষ্টাচার প্রদর্শন করেছিলেন।
২। নম্র-ভদ্র আচরণকে বলে	স্বামী বিবেকানন্দ।
৩। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং	সত্য।
৪। পরমতসহিষ্ণুতার আদর্শ তুলে ধরেছিলেন	শিষ্টাচার।
৫। সকল ধর্মই	প্রণাম করি।
	স্বামী প্রণবানন্দ।

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। আমাদের চরিত্রকে উন্নত করে —

ক. ধন-দৌলত খ. জমি-জমা
গ. শিষ্টাচার ঘ. বংশগৌরব

২। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কার প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করেছিলেন?

ক. অর্জুন খ. ইন্দ্র
গ. নকুল ঘ. নারদ

৩। দ্বাপর যুগে অত্যাচারী হয়ে উঠেছিলেন কে?

ক. রাজা শিবি খ. রাজা রন্তিদেব
গ. রাজা শিশুপাল ঘ. রাজা হরিশচন্দ্র

৪। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতাররূপে কোথায় অবতীর্ণ হন?

ক. বৃন্দাবনে খ. মথুরায়
গ. গয়ায় ঘ. পুরীতে

৫। নারদকে বলা হয় —

ক. দেবর্ষি খ. শ্রুতর্ষি
গ. ব্রহ্মর্ষি ঘ. মহর্ষি

৬। শিকাগোতে পরমতসহিষ্ণুতা দেখিয়েছিলেন —

ক. স্বামী দেবানন্দ খ. স্বামী প্রণবানন্দ
গ. স্বামী বেদানন্দ ঘ. স্বামী বিবেকানন্দ

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। শিষ্টাচার কাকে বলে?
২। শিষ্টাচার প্রদর্শন করলে সমাজ কেমন হবে?
৩। শিশুপাল কোন দেশের রাজা ছিলেন? তিনি কেমন লোক ছিলেন?
৪। নারদকে দেখে শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়ালেন কেন?
৫। পরমতসহিষ্ণুতা কাকে বলে?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। শিষ্টাচারের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।
২। দেবর্ষি নারদ যখন শ্রীকৃষ্ণের নিকট এলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ কীভাবে শিষ্টাচার প্রদর্শন করেছিলেন?
৩। পরমতসহিষ্ণুতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।
৪। শিকাগোতে বিবেকানন্দ হিন্দুধর্ম সম্পর্কে যা বলেছিলেন তা তোমার পাঠ্যপুস্তক অনুসারে নিজের ভাষায় লেখ।
৫। 'তুমি তাদের সকলের একমাত্র লক্ষ্য'— কে, কাদের একমাত্র লক্ষ্য? কেন?

ষষ্ঠ অধ্যায়

অহিংসা ও পরোপকার

অহিংসা

কিছু কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা অন্যের সুখে ঈর্ষা করেন না, বরং সুখ পান। কারো অকল্যাণ কামনা করেন না। কেউ অকল্যাণ করলেও তাঁর কল্যাণ করেন। অন্যের উন্নতিতে আনন্দ পান। কাউকে পীড়ন করেন না। তাঁরা অন্যের উপকার করেন। অন্যেরা যাতে সুখে থাকে তার উপদেশ দেন। কখনই কাউকে হিংসা করেন না। নিজের ক্ষতি হলেও কারো অমঙ্গল কামনা করেন না। এ মনোভাব ও আচরণ একটি মহৎ গুণ। এ নৈতিক গুণটির নাম অহিংসা। অহিংসা ধর্মের অঙ্গ।

অহিংস ব্যক্তি সকলের শ্রদ্ধা পান। জীবনে অনেক বড় হতে পারেন। হিংসা মানুষের মনকে ছোট করে দেয়। আর ছোট মনে কোনো বড় কাজ করা যায় না। তাই বড় হতে হলে আমাদের অহিংস হতে হবে।

নিম্নে মহর্ষি বশিষ্ঠের অহিংসার একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো।

বশিষ্ঠের অহিংসা ধর্ম

প্রাচীন ভারতের কথা। বশিষ্ঠ নামে একজন ঋষি ছিলেন। তিনি ছিলেন ব্রহ্মর্ষি। অনেক সুখ্যাতি তাঁর। সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করে। ভক্তি করে। তাঁর কথা সবাই সম্মানের সঙ্গে মান্য করে।

তখন বিশ্বামিত্র নামে একজন ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। সাধনা করে তিনি রাজর্ষি হয়েছিলেন। কিন্তু এতে তিনি সন্তুষ্ট নন। তিনি ব্রহ্মর্ষি হতে চান। বশিষ্ঠের মতো ব্রহ্মর্ষি। কিন্তু ব্রহ্মর্ষি হওয়া এত সহজ ব্যাপার নয়। তিনি মনে মনে বশিষ্ঠকে হিংসা করতেন।

একদিন অনেক লোকজন নিয়ে বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের আশ্রমে গেলেন। গিয়ে বললেন, তাঁরা খুব ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত।

বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে আশীর্বাদ করছেন

হঠাৎ এত লোকের ক্ষুধা-তৃষ্ণা মেটানো কঠিন কাজ। কিন্তু বশিষ্ঠের জন্য কঠিন হলো না। তাঁর আশ্রমে ছিল একটি কামধেনু। তার কাছে চাইতেই পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার ও পানীয় পাওয়া গেল। বশিষ্ঠ তা দিয়ে বিশ্বামিত্র ও তাঁর লোকজনদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা মেটালেন।

এসব দেখে বিশ্বামিত্রের হিংসা আরও বেড়ে গেল। তিনি বশিষ্ঠের কাছে কামধেনুটি দাবি করলেন। কিন্তু কামধেনুটি বশিষ্ঠের অত্যন্ত প্রিয়। তাই তিনি বিশ্বামিত্রের প্রস্তাবে সম্মত হলেন না।

নিচের ছকটি পূরণ করি :

১। অহিংসা ধর্মের	
২। অহিংস ব্যক্তি সকলের	
৩। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের কাছে চেয়েছিলেন	

বিশ্বামিত্র এতে ক্ষেপে গেলেন। তিনি জোর করে ধেনুটি নিতে চাইলেন। তখন কামধেনু থেকে অনেক যোদ্ধার সৃষ্টি হলো। তাদের সঙ্গে বিশ্বামিত্র ও তাঁর লোকদের ভীষণ যুদ্ধ হলো। যুদ্ধে বিশ্বামিত্রের পরাজয় হলো। তিনি বশিষ্ঠের কাছে ক্ষমা চাইলেন। বশিষ্ঠ তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন এবং আশীর্বাদ করলেন ব্রহ্মর্ষি হওয়ার। বশিষ্ঠের আশীর্বাদে বিশ্বামিত্র ব্রহ্মর্ষি হয়েছিলেন। এ ঘটনায় বশিষ্ঠের অহিংসা ধর্ম সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

পরোপকার

যাঁরা মহৎ তাঁরা কখনই নিজের কথা ভাবেন না। সবসময় পরের কথাই ভাবেন। এর বিনিময়ে তাঁরা কিছু চান না। এই যে পরের মঙ্গল করার মনোভাব, একেই বলে পরোপকার। পরোপকার করা ধর্মের একটি অঙ্গ।

হিন্দুধর্ম মতে সকল জীবের মধ্যেই ঈশ্বর আছেন। তাই জীবের উপকার করা মানেই ঈশ্বরের সেবা করা। জীবের সেবা করলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন। পরের উপকার করার মধ্য দিয়ে এক পরম আনন্দ পাওয়া যায়। এতে মনের প্রসারতা বাড়ে। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি বৃদ্ধি পায়। সমাজে শান্তি বিরাজ করে। পরস্পরের প্রতি সহানুভূতির সৃষ্টি হয়। পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসতে শেখে। কাজেই আমরাও পরের উপকার করব। এতে আমাদের মন বড় হবে। আমাদের সমাজ সুন্দর হবে।

এখানে দৃষ্টান্ত হিসেবে ভীমের পরোপকারের একটি ঘটনা তুলে ধরা হলো।

ভীমের পরোপকার

আমরা জানি যে, মহাভারতের কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে ভীষণ শত্রুতা ছিল। কৌরবেরা ছিলেন দুষ্ট প্রকৃতির। একবার তাঁরা কৌশলে কুন্তীসহ পাণ্ডবদের বনে পাঠিয়ে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পাণ্ডবেরা বুদ্ধিবলে বেঁচে যান। তখন তাঁরা ব্রাহ্মণবেশে একচক্রা নগরে বাস করতেন। সেখানে এক ব্রাহ্মণের গৃহে তাঁরা আশ্রয় নিয়েছিলেন।

একদিন কুন্তী দেখেন ব্রাহ্মণের ঘরে কান্নার রোল পড়েছে। তিনি কাছে গিয়ে কান্নার কারণ জানতে চাইলেন। ব্রাহ্মণ বললেন, 'নগরের অদূরে একটা বন আছে। সেখানে থাকে এক রাক্ষস। নাম বক। প্রতিদিন তার আহারের জন্য একজন মানুষ, দুটি মহিষ এবং অনেক ভাত দিতে হয়। নতুবা সে সবাইকে খেয়ে ফেলবে। আজ আমার পরিবারের পালা। যে কেউ একজনকে রাক্ষসের কাছে যেতে হবে। কিন্তু কেউ কাউকে ছাড়তে চাচ্ছে না। এজন্য সবাই কাঁদছে।'

২০২৫

ভীম রাক্ষসকে আছাড় মারছেন

ব্রাহ্মণের কথা শুনে কুন্তী বললেন, 'আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। আমার পাঁচ ছেলে। তাদের মধ্যে দ্বিতীয় ভীম খুব শক্তিশালী। সে যাবে ঐ রাক্ষসের কাছে।'

ব্রাহ্মণ বললেন, 'সে হয় না, আপনারা আমাদের শরণার্থী। আপনাদের কোনো অকল্যাণ আমরা করতে পারি না। কারণ ঐ রাক্ষসের কাছে যে যাবে, সে আর ফিরে আসবে না।'

নিচের ছকটি পূরণ করি :

১। পরের মঙ্গল করার নাম	
২। পরোপকার করলে সমাজে	
৩। কুন্তীর দ্বিতীয় ছেলে	

কুন্তী তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'আপনি ভয় পাবেন না। ভীম ঐ রাক্ষসকে মেরে তবে ফিরবে। তবে এ কথা কাউকে বলবেন না।'

কুন্তী ব্রাহ্মণকে রাজি করিয়ে ভীমকে পাঠালেন রাক্ষসের কাছে। রাক্ষস তখন তার আস্তানায় ছিল না। ভীম তখন বসে মনের আনন্দে খাবারগুলো খাচ্ছিলেন। এমন সময়

রাক্ষস এসে ভীমকে খাবার খেতে দেখে ভীষণ ক্ষেপে গেল। সে একটা গাছের কান্ড ভেঙে তেড়ে এলো। তারপর গাছের কান্ডটা ছুড়ে মারল ভীমের দিকে। ভীম মুচকি হেসে বাঁ হাত দিয়ে সেটা ধরে ছুড়ে ফেলে দিলেন। এতে রাক্ষসটা আরও ক্ষেপে গেল। এবার সে দৌড়ে গিয়ে ভীমকে জাপটে ধরল। ভীম উঠে দাঁড়িয়ে এক আছাড়ে রাক্ষসটাকে মেরে ফেললেন। এর ফলে ঐ ব্রাহ্মণ পরিবারসহ নগরের সবাই বক রাক্ষসের হাত থেকে রেহাই পেল। বক রাক্ষস মারা গেছে শুনে নগরের সবাই আনন্দ করতে লাগল। আর অন্য রাক্ষসরাও ঐ বন ছেড়ে অন্যত্র চলে গেল। কিন্তু কুন্তী যেহেতু নিষেধ করেছেন, সেহেতু ব্রাহ্মণ সকলকে বললেন, 'এক পরোপকারী মহাপুরুষ আমাদের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে বক রাক্ষসকে মেরেছেন।'

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। ______ব্যক্তি সবসময় সকলের মঙ্গল কামনা করেন।

২। বশিষ্ঠের আশ্রমে ছিল একটি ______।

৩। বশিষ্ঠের আশীর্বাদে বিশ্বামিত্র ______ হয়েছিলেন।

৪। পান্ডবেরা ব্রাহ্মণবেশে ______ নগরে বাস করতেন।

৫। পান্ডবদের মধ্যে ______ ছিলেন খুব শক্তিশালী।

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। বড় হতে হলে আমাদের → অহিংস হতে হবে।	ধর্ম।
২। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের মতো	তাঁর কামধেনুটি।
৩। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের কাছে চেয়েছিলেন	ব্রহ্মর্ষি হতে চেয়েছিলেন।
৪। হিন্দুধর্ম মতে সকল জীবের মধ্যেই	অহিংস হতে হবে।
৫। অহিংসা পরম	আশীর্বাদ।
	ঈশ্বর আছেন।
	যজ্ঞের অশ্বটি।

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। বশিষ্ঠ কোন শ্রেণির ঋষি ছিলেন?

ক. রাজর্ষি   খ. শ্রুতর্ষি

গ. ব্রহ্মর্ষি   ঘ. মহর্ষি

২। বিশ্বামিত্র জাতিতে কী ছিলেন?

ক. ক্ষত্রিয় খ. ব্রাহ্মণ
গ. বৈশ্য ঘ. শূদ্র

৩। বনে বাস করত যে রাক্ষস তার নাম কী ছিল?

ক. তাড়কা খ. পূতনা
গ. অঘ ঘ. বক

৪। রাক্ষসকে মারতে কে গিয়েছিলেন?

ক. অর্জুন খ. ভীম
গ. নকুল ঘ. সহদেব

৫। ভীমের কথা বলতে কে নিষেধ করেছিলেন?

ক. যুধিষ্ঠির খ. মাদ্রী
গ. কুন্তী ঘ. ব্রাহ্মণ

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। অহিংসা কী?
২। বিশ্বামিত্র কেন বশিষ্ঠকে হিংসা করতেন?
৩। কামধেনু কাকে বলে?
৪। পাণ্ডবেরা বেঁচে গিয়ে কোথায় বাস করতেন?
৫। ভীম রাক্ষসটাকে কীভাবে মেরেছিলেন?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। অহিংসা কাকে বলে? বুঝিয়ে লেখ।
২। বশিষ্ঠ কীভাবে বিশ্বামিত্রকে আপ্যায়ন করলেন?
৩। পরোপকারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।
৪। ব্রাহ্মণের ঘরে কান্নার রোল উঠেছিল কেন?
৫। নগরবাসী বক রাক্ষসের হাত থেকে কীভাবে রক্ষা পেয়েছিল?

২০২৫

সপ্তম অধ্যায়

স্বাস্থ্যরক্ষা ও যোগব্যায়াম এবং আসন

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্বাস্থ্যরক্ষা ও যোগব্যায়াম

আমরা জানি, শরীর ও মনকে সুস্থ রাখার নাম স্বাস্থ্যরক্ষা। শরীর ও মন সুস্থ না থাকলে জীবন হয় অশান্তিময়। ঠিকমতো ধর্মচর্চাও করা যায় না। তাই তো বলা হয়েছে, 'শরীরম্ আদ্যং খলু ধর্ম – সাধনম্।' আগে শরীরের দিকে মনোযোগ দিয়ে স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে হবে। তারপর ধর্মসাধনা। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বেশ কিছু নিয়ম পালন করতে হয়। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে নিয়মিত খেলাধুলা, ব্যায়াম, যোগব্যায়াম, পরিমিত আহার, মাঝে-মাঝে উপবাস, সুখে-দুঃখে সকল অবস্থায় মনকে প্রফুল্ল রাখা ইত্যাদি।

এখন স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় হিসেবে যোগব্যায়াম সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

যোগব্যায়াম

অনেক অনেক আগের কথা। মুনি-ঋষিরা ঈশ্বরের উপাসনা করতে গিয়ে দেখলেন, শরীর নীরোগ ও কর্মক্ষম না হলে ঈশ্বর-চিন্তা কেন, কোনো কাজই ভালোভাবে করা যায় না। তাঁরা তখন চিকিৎসা বিজ্ঞানের পাশাপাশি যোগসাধনার পদ্ধতি উদ্ভাবন করলেন, যাতে শরীর ও মন সুস্থ থাকে, কর্মক্ষম থাকে এবং একমনে ঈশ্বরের উপাসনা করা যায়।

এ যোগসাধনার একটি উপায় হলো যোগব্যায়াম। শ্বাসপ্রশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ, শরীরকে চালনা করার বিশেষ-বিশেষ পদ্ধতি, আসন ইত্যাদিকে এক কথায় যোগব্যায়াম বলা হয়।

যোগ শব্দটির দুটো অর্থ আছে। একটি হচ্ছে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ। অপরটি হচ্ছে চিত্তবৃত্তির নিরোধ। আমাদের মন এবং ইন্দ্রিয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা, যাতে আমরা শরীর ও মনের জন্য ক্ষতিকর কাজ করতে না পারি। যোগব্যায়াম হচ্ছে শরীর ও মনকে নিয়ন্ত্রণ করে স্বাস্থ্যরক্ষার অন্যতম উপায়।

নিচের ছকটি পূরণ করি :

১। শরীরকে সুস্থ রাখার নাম	
২। শরীর ভালো না থাকলে	
৩। যোগব্যায়াম স্বাস্থ্যরক্ষার	

যোগব্যায়াম অনুশীলন করলে —

- মস্তিষ্কের ধারণ শক্তি বাড়ে।
- স্নায়ু সতেজ ও মাংসপেশি সবল হয়।
- কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়।
- রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বাড়ে।
- কিছু-কিছু রোগ সেরে যায়।
- দেহের শক্তির পাশাপাশি মনের শক্তি বাড়ে।

পরিমিত আহার

পরিমিত আহার স্বাস্থ্যরক্ষার অন্যতম উপায়। খাদ্য ও পানীয় গ্রহণকে আমরা 'আহার' বলি। বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন, কর্মশক্তি ও রোগ প্রতিরোধের শক্তি সৃষ্টির জন্য আহারের প্রয়োজন। তবে সে আহার পরিমিত ও পুষ্টিকর হওয়া চাই।

কিন্তু আমরা সাধারণত মুখরোচক খাবার খেতে পছন্দ করি। আর মুখরোচক খাবার পেলে বেশি করে খেতে থাকি। বেশি আহার বা অপরিমিত আহার যে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর আমরা তা ভুলে যাই। তখন অসুস্থ হয়ে পড়ি। তাই তো শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস বলেছেন, 'বেশি খাবি তো কম খা।'

অপরিমিত আহার

২০২৪

অপরিমিত আহারের কুফল

একদম না খেলে দেহের ক্ষয়পূরণ হবে না, কর্মশক্তি সৃষ্টি হবে না। আমরা দুর্বল হয়ে পড়ব। আমাদের দেহ অচল হয়ে পড়বে। তারপর দেহ বিনষ্ট হবে। জীবনের ঘটবে অবসান। বেঁচে থাকার জন্যই আহারের প্রয়োজন। আবার অপরিমিত আহারও স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। আমাদের দেহ ও মনকে অসুস্থ করে তোলে। কখনো কখনো জীবনেরও অবসান ঘটায়।

সুতরাং আমরা প্রয়োজনমতো এবং পরিমিত আহার গ্রহণ করব। অপরিমিত আহার গ্রহণ থেকে বিরত থাকব।

উপবাস

আহার গ্রহণে বিরতি দেওয়ার নাম উপবাস। উপবাসের আরেক নাম অনশন। চলতি কথায় উপবাসকে বলে 'উপোস'।

শরীর এক বিচিত্র যন্ত্র।

একদম উপোস করে থাকলে শরীর অচল হয়ে যাবে। আবার বেশি খেলেও শরীরের ক্ষতি হবে। আবার এই শরীর সুস্থ রাখার জন্য মাঝে মাঝে উপবাস করতে হয়। হিন্দুধর্ম গ্রন্থে পরিমিত আহার গ্রহণের উপদেশ দেওয়ার পাশাপাশি নিয়ম করে উপবাস থাকার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। মাঝে মাঝে পরিমিত সময়ের উপবাস শরীরের খাদ্যগ্রহণের ক্ষমতা বাড়ায় এবং শরীরকে সুস্থ রাখে। তাই হিন্দুধর্মে একাদশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে উপবাস করতে বা হালকা খাবার গ্রহণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

যোগব্যায়াম, পরিমিত আহার ও উপবাস ধর্মের অঙ্গ। যে শরীর ও মন দিয়ে আমরা ঈশ্বর ও দেব-দেবীর উপাসনা করব, তা যদি সুস্থ না থাকে, তাহলে আমরা সঠিকভাবে তাঁর উপাসনা করতে পারব না। তাই সঠিকভাবে ধর্মচর্চার জন্য শরীর ও মনের সুস্থতা প্রয়োজন। আর যোগব্যায়াম হচ্ছে শরীর ও মন সুস্থ রাখার অন্যতম উপায়। একই কথা পরিমিত আহার গ্রহণ ও উপবাসের ক্ষেত্রেও খাটে।

পূজা-পার্বণ ও ধর্মানুষ্ঠানের সময় আমরা উপবাস থাকি। পূজা হয়ে গেলে আমরা উপবাস ভেঙে আহার গ্রহণ করি। যেমন — সরস্বতীপূজার সময় আমরা অঞ্জলি দেওয়ার পর আহার গ্রহণ করি।

যোগব্যায়াম ঈশ্বরের সঙ্গে যোগের জন্য শরীর ও মনকে প্রস্তুত করে। পরিমিত আহার

গ্রহণ ও উপবাস আমাদের সংযম শেখায়। আর সংযম ধর্মের অন্যতম লক্ষণ। সাধনার প্রথম সোপান।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যোগব্যায়াম, পরিমিত আহার এবং উপবাসের সঙ্গে ধর্মের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। শরীর ও মনকে সুস্থ রাখার নাম ______ ।
২। আগে শরীর পরে ______ ।
৩। যোগসাধনার একটি উপায় হলো ______ ।
৪। পরিমিত আহার ______ জন্য উপকারী।
৫। স্বাস্থ্যের জন্য আহারের পাশাপাশি ______ প্রয়োজন।

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। আগে শরীর পরে →	যোগব্যায়াম।
২। স্বাস্থ্যরক্ষার একটি উপায়	প্রয়োজন।
৩। পরিমিত আহার স্বাস্থ্যের জন্য	বাড়ায়।
৪। উপবাস আহার গ্রহণের ক্ষমতা	ধর্মসাধনা।
	মুখরোচক খাবার।

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। স্বাস্থ্যের জন্য দরকার –

ক. যোগব্যায়াম
খ. প্রচুর খাবার
গ. মুখরোচক খাবার
ঘ. প্রতিনিয়ত উপবাস

২। যোগসাধনার পদ্ধতি কারা উদ্ভাবন করেছিলেন ?

ক. রাজারা
খ. দেবতারা
গ. মুনি-ঋষিরা
ঘ. অসুরেরা

৩। কোন তিথিতে বিশেষভাবে উপবাস করার নিয়ম রয়েছে?

ক. একাদশী　　খ. দ্বাদশী
গ. ত্রয়োদশী　　ঘ. চতুর্দশী

৪। আমরা সাধারণত কেমন খাবার খেতে পছন্দ করি?

ক. মুখরোচক　　খ. পুষ্টিকর
গ. দামি　　ঘ. সস্তা

৫। যোগব্যায়াম করলে মানুষ —

ক. ক্লান্ত হয়　　খ. দুর্বল হয়
গ. স্বাস্থ্যবান হয়　　ঘ. মোটা হয়

৬। উপাসনার জন্য প্রয়োজন —

ক. তীর্থযাত্রা　　খ. শরীর ও মনের সুস্থতা
গ. ধন-সম্পদ　　ঘ. মন্দির

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। যোগব্যায়াম কাকে বলে?
২। উপবাস বলতে কী বোঝ?
৩। আহার বলতে কী বোঝায়?
৪। একদম না খেলে কী হয়?
৫। শরীর সুস্থ রাখার একটি উপায় লেখ।

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। যোগব্যায়াম কাকে বলে বুঝিয়ে লেখ।
২। যোগব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।
৩। পরিমিত আহার বলতে কী বোঝ?
৪। যোগব্যায়ামের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।
৫। উপবাসের উপকারিতা কী?
৬। 'উপবাস ধর্মের অঙ্গ।' — ব্যাখ্যা কর।
৭। কোন কোন তিথিতে বিশেষভাবে উপবাস পালনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আসন

'আসন' কথাটির সঙ্গে আমরা পরিচিত। আমরা জানি যোগব্যায়ামের একটি বিশেষ পদ্ধতিকে আসন বলে।

নিয়মিত আসন অনুশীলন করলে শরীরের প্রতিটি স্নায়ুকোষ ও স্নায়ুতন্ত্র, টিস্যু, পেশি সতেজ হয় এবং কর্মক্ষম থাকে। এতে শরীর সুস্থ থাকে। মন প্রশান্ত থাকে।

আসন অনুশীলন করলে —

- দেহ নমনীয় হয়, সবল হয় এবং মাংসপেশি পুষ্ট হয়।
- দেহ ও মনের সমতা রক্ষিত হয়।
- অবাঞ্ছনীয় চিন্তাকে দূরে রাখা যায়।
- সাধনার জন্য মন প্রস্তুত হয়।

আমরা পদ্মাসন, শবাসন, বজ্রাসন ও পদহস্তাসন অনুশীলনের পদ্ধতি ও উপকারিতা সম্পর্কে জেনেছি। এখন সর্বাঙ্গাসন ও গোমুখাসন সম্পর্কে জানব।

সর্বাঙ্গাসন

যে আসন অভ্যাস করলে দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ, সবল ও নীরোগ হয় তাকে সর্বাঙ্গাসন বলে।

অনুশীলন পদ্ধতি

চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ি। পা-দুটি সোজা করে ধীরে ধীরে উপরে তুলি। তারপর কনুই শরীরের সঙ্গে প্রায় সমান্তরাল রেখে হাতের চেটো দিয়ে পিঠ ঠেলে ধরি।

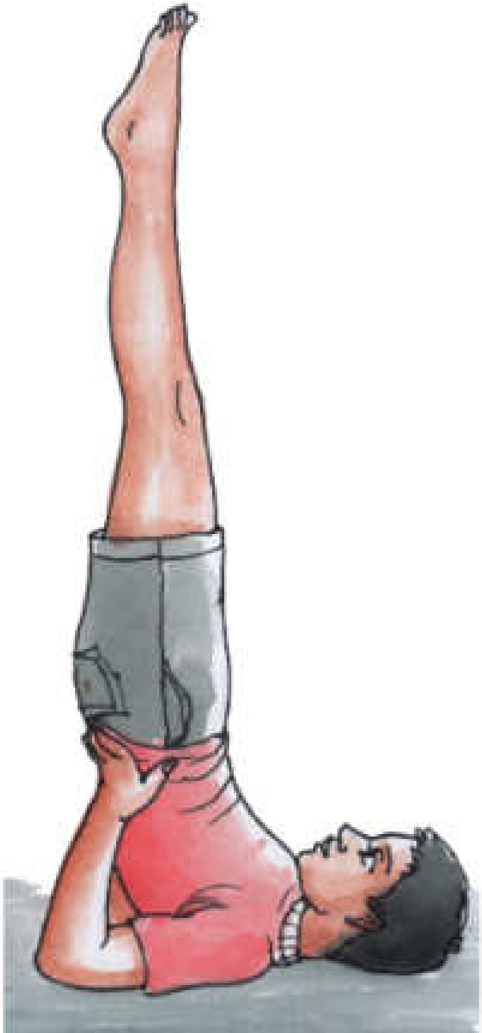

সর্বাঙ্গাসন

এ অবস্থায় থুতনি যেন বুকের উপর কণ্ঠকূপে লেগে থাকে। এভাবে দম নিতে নিতে ও ছাড়তে ছাড়তে কুড়ি/ ত্রিশ সেকেন্ড থাকতে হবে। পরে দম ছাড়তে ছাড়তে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়তে হবে। এভাবে এ আসন চারবার অভ্যাস করতে হয়। প্রতিবার অভ্যাসের পর ত্রিশ সেকেন্ড শবাসন করতে হয়।

দলগত কাজ : সর্বাঙ্গাসনটি শ্রেণিকক্ষে দলগতভাবে করে দেখাও।

সর্বাঙ্গাসনের উপকারিতা

যোগশাস্ত্র অনুসারে এ আসনের অনুশীলন করলে সকল প্রকার ব্যাধির বিনাশ ঘটে। সর্বাঙ্গাসন করলে থাইরয়েড ও স্নায়ুমণ্ডলী সতেজ হয়। দেহ অত্যন্ত সক্রিয়, সবল ও কর্মঠ হয়। এ আসন দেহের অপ্রয়োজনীয় মেদ কমায়। কোষ্ঠ-কাঠিন্য দূর করে। হাঁপানি রোগ প্রতিরোধ করে।

গোমুখাসন

এ আসন অনুশীলনের সময় অনুশীলনকারীর পায়ের অবস্থান গরুর মুখের মতো হয়। তাই এ আসনের নাম গোমুখাসন।

অনুশীলন পদ্ধতি

পা দুটিকে সামনে ছড়িয়ে দিয়ে বসতে হবে। বাম পা হাঁটুর কাছে ভাঁজ করে ওই পায়ের গোড়ালি ডান দিকের নিতম্বের পাশে স্পর্শ করাতে হবে। ঠিক একইভাবে বাম পায়ের উপর দিয়ে এনে ডান পায়ের গোড়ালি বাম দিকের নিতম্বে স্পর্শ করাতে হবে।

গোমুখাসন (সামনের দিক থেকে)

বাম হাঁটুর উপর ডান পায়ের হাঁটু একই অবস্থায় থাকবে। এবার ডান হাত সোজা মাথার উপরে তুলে এনে ডান কনুই থেকে ভাঁজ করে পিঠের দিকে রাখতে হবে। এবার বাম হাত কনুই থেকে ভাঁজ করে পিঠের উপর দিকে আনতে হবে। তারপর বাম হাতের আঙুলগুলো দিয়ে ডান হাতের আঙুলগুলো ধরার চেষ্টা করতে হবে। মেরুদন্ড সোজা থাকবে। এভাবে প্রতি পায়ে দুবার করে চারবার অভ্যাস করতে হবে। প্রতিবার অভ্যাসের পর কুড়ি সেকেন্ড শবাসন করতে হবে।

গোমুখাসন (পেছনের দিক থেকে)

দলগত কাজ : শ্রেণিকক্ষে দলে ভাগ হয়ে একদল সর্বাঙ্গাসন এবং একদল গোমুখাসন করি।

গোমুখাসনের উপকারিতা

১। অনিদ্রা দূর হয়।
২। অসমান কাঁধ সমান হয়।
৩। মেরুদন্ড সোজা হয়।
৪। পরিপাকতন্ত্রের সমস্যা দূর হয়।
৫। পায়ের বাত রোগের উপশম ঘটে।
৬। উত্তেজনা প্রশমিত হয়।

নিচের ছকটি পূরণ করি :

১। যোগব্যায়ামের একটি বিশেষ পদ্ধতি	
২। সর্বাঙ্গাসন করলে স্নায়ুমণ্ডলী	
৩। যোগাসন করলে উত্তেজনা	

সর্বাঙ্গাসন ও গোমুখাসনসহ বেশ কয়েকটি আসনের বিশেষ-বিশেষ উপকারিতা সম্পর্কে আমরা জেনেছি। এও জেনেছি, আসন দেহ ও মনের সুস্থতা আনে। আমাদের প্রশান্ত করে তোলে। কিছু কিছু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে নির্দিষ্ট আসনে বসতে হয়। আবার আসন আমাদের দেহ ও মনকে একাগ্র চিত্তে ঈশ্বরের উপাসনার জন্য প্রস্তুত করে। এভাবে আসন হয়ে উঠেছে ধর্মের অঙ্গ।

সুতরাং স্বাস্থ্যরক্ষা ও ধর্মচর্চার জন্যই আমরা নিয়মিত আসনের অনুশীলন করব।

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। নিয়মিত আসন করলে শরীর ______ থাকে।

২। আসন অনুশীলন করলে সাধনার জন্য মন ______ হয়।

৩। পেশি সতেজ রাখা আসনের একটি ______ ।

৪। সর্বাঙ্গাসন করলে সকল প্রকার ______ বিনাশ ঘটে।

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। আসন অনুশীলন করলে	আসন।
২। সর্বাঙ্গাসন করলে	সর্বাঙ্গাসন।
৩। স্নায়ু সতেজ রাখার একটি উপায় হলো	ক্লান্তি দূর হয়।
৪। হাঁপানি প্রতিরোধ করে	দেহ নমনীয় হয়।
৫। আসন ধর্মের	অঙ্গ।
	গোমুখাসন।

২০২৫

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। আসন করলে সতেজ থাকে —

ক. পেশি　　খ. চুল
গ. পা　　ঘ. পেট

২। গোমুখাসন অনুশীলনের সময় পায়ের অবস্থান হয় —

ক. কুকুরের মুখের মতো　　খ. বিড়ালের মুখের মতো
গ. গরুর মুখের মতো　　ঘ. পাখির ঠোঁটের মতো

৩। সর্বাঙ্গাসন করলে সুস্থ ও সবল হয় —

ক. হাঁটু　　খ. হাত ও পা
গ. বুক ও পিঠ　　ঘ. সকল অঙ্গ

৪। আসন মনকে —

ক. প্রশান্ত করে　　খ. চঞ্চল করে
গ. উত্তেজিত করে　　ঘ. ক্লান্ত করে

ঘ. নিচের প্রশ্নোগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। আসনের উপকারিতা কী?
২। চিন্তার ক্ষেত্রে আসনের গুরুত্ব কী?
৩। গোমুখাসনের একটি উপকারিতা বর্ণনা কর।
৪। উপাসনার ক্ষেত্রে আসনের ভূমিকা কী?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। নিয়মিত অনুশীলনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।
২। সর্বাঙ্গাসন অনুশীলনের পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৩। গোমুখাসন অনুশীলনের পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৪। উপাসনার ক্ষেত্রে আসনের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

দেশপ্রেম

প্রতিটি মানুষ জন্মগ্রহণ করে পৃথিবীর একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে, যা তার জন্মভূমি বা নিজ দেশ। মানুষ জন্মভূমি বা দেশের আলো-বাতাস, অন্ন-জলে লালিত-পালিত হয়ে বেড়ে ওঠে। এ কারণে জন্মভূমি বা দেশের প্রতি মানুষের থাকে এক ধরনের আবেগময় অনুরাগ। দেশের ভাষা, সাহিত্য এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে গড়ে ওঠে তার নাড়ির সম্পর্ক। দেশের জন্য জন্ম নেয় নিবিড় ভালোবাসা। দেশের প্রতি মানুষের এই অনুরাগ ও ভালোবাসাই দেশপ্রেম।

এই দেশপ্রেম কীভাবে প্রকাশ পায় ? দেশপ্রেম প্রকাশ পায় মানুষের কাজে, মানুষের আচরণে। দেশপ্রেম প্রকাশ পায় দেশের মঙ্গলের জন্য কঠোর পরিশ্রম ও আত্মত্যাগে। দেশ শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হলে দেশপ্রেমিক শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। যুদ্ধ করে দেশের স্বাধীনতাকে রক্ষা করেন। দেশের উন্নতির জন্য কাজ করেন। এমনকি প্রয়োজনে দেশের জন্য হাসিমুখে জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেন।

দেশপ্রেম আত্মমর্যাদার উৎস। মনুষ্যত্বের অঙ্গ। দেশপ্রেম মানুষকে স্বার্থপরতা, সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীগত সংকীর্ণতা, রাজনৈতিক মতাদর্শগত ভেদাভেদ থেকে ঊর্ধ্বে উঠতে সহায়তা করে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে একই চেতনায় একপ্রাণ হয়ে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। উদ্বুদ্ধ করে দেশের কল্যাণে আত্মনিবেদনে।

দেশপ্রেম মানুষের মধ্যে আবেগ, উদ্যম ও কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। দেশ ও জাতির অগ্রগতির লক্ষ্যে প্রেরণাময় চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। তাই দেশ ও জাতির উন্নয়নে দেশপ্রেমের গুরুত্ব অপরিসীম।

দেশে দেশে যাঁরা দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখছেন বা রেখেছেন, তাঁরা সকলের শ্রদ্ধেয় ও পূজনীয়। তাঁরা সারা বিশ্বের মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত। দেশপ্রেমের জন্য তাঁরা চির স্মরণীয় এবং বরণীয়।

প্রাচীনকালেও অনেকে দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে অমর হয়ে আছেন। মহাভারত থেকে এমন একজন দেশপ্রেমিক রানির কাহিনী বলছি।

বিদুলার দেশপ্রেম

প্রাচীনকালে সৌবীর নামে একটি রাজ্য ছিল। বিদুলা ছিলেন সৌবীর রাজ্যের রানি। সৌবীররাজ আর বিদুলার একটি মাত্র পুত্র ছিলেন। তাঁর নাম সঞ্জয়। সঞ্জয় যখন যুবক, তখন হঠাৎ সৌবীররাজ মারা যান। এ সময় সুযোগ বুঝে সিন্ধুদেশের রাজা সৌবীর রাজ্য আক্রমণ করেন। সঞ্জয় সহজেই পরাজিত হলেন। সিন্ধুরাজ সৌবীর রাজ্য অধিকার করলেন। রাজ্য হারিয়ে ম্লান মুখে শুয়ে আছেন সঞ্জয়। হারানো রাজ্য পুনরুদ্ধারের কোনো চেষ্টাই তিনি করছেন না। এদিকে রানি বিদুলা পরাধীনতা সহ্য করতে পারছেন না। তিনি পুত্র সঞ্জয়ের কাছে গিয়ে তাঁকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে উৎসাহ দিলেন। সঞ্জয়কে ভর্ৎসনা করে তিনি বললেন, 'মনে হচ্ছে তুমি আমার পুত্র নও। আমার পুত্র এমন কাপুরুষ হতে পারে না। তুমি তোমার পিতা সৌবীররাজের কথা স্মরণ কর। কী তেজ আর সাহস ছিল তাঁর। এ পরাধীনতা তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারতেন না। নির্ভীক হও। শত্রুকে পরাজিত করে হারানো রাজ্য উদ্ধার কর।'

বিদুলা সঞ্জয়কে যুদ্ধ করার জন্য উৎসাহিত করছেন

সঞ্জয় বললেন, 'আমি যদি যুদ্ধে মারা যাই তাহলে সমস্ত পৃথিবী পেয়ে তোমার কী হবে, মা ?' বিদুলা ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। তিনি বললেন, 'দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মৃত্যু, সে তো বীরের মৃত্যু ! মরতে তো একদিন হবেই। স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করে, হারানো রাজ্য শত্রুমুক্ত করার জন্য যুদ্ধ করে যদি প্রাণ যায়, যাক। সুতরাং হয় স্বাধীনতা না হয় মৃত্যু—বীরের মতো এই পণ করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও।'

মা বিদুলার কথায় সঞ্জয়ের ভ্রান্তি দূর হলো। তিনি উৎসাহিত হয়ে যুদ্ধ করলেন। পরাজিত হলেন সিন্ধুরাজ। সঞ্জয় হারানো রাজ্য ফিরে পেলেন।

প্রজাদের জয়ধ্বনিতে প্রকম্পিত হলো সৌবীর-রাজ্য। অভিনন্দন লাভ করলেন সঞ্জয়। আর দেশপ্রেমের গৌরবে বিদুলা স্মরণীয় হয়ে রইলেন। সত্যিই ভাবতে অবাক লাগে, কতখানি দেশপ্রেম থাকলে পুত্রকে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে দেওয়া যায়। বিদুলা এমনই গভীর দেশপ্রেমের অধিকারিণী ছিলেন।

আমরাও বিদুলার মতো দেশপ্রেমিক হবো। ভালোবাসব আমাদের দেশকে। দেশের মঙ্গলের জন্য, দেশের উন্নতির জন্য, দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কাজ করব।

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। মানুষ জন্মগ্রহণ করে পৃথিবীর নির্দিষ্ট কোনো ______।
২। দেশের প্রতি ভালোবাসাকে বলে ______।
৩। দেশপ্রেমিক ______ করে দেশের স্বাধীনতাকে রক্ষা করেন।
৪। দেশপ্রেমিক হাসিমুখে ______ উৎসর্গ করেন।
৫। দেশপ্রেমের গৌরবে ______ স্মরণীয় হয়ে রইলেন।
৬। আমরা ভালোবাসব ______।

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। দেশের জন্য জন্ম হয়	না হয় মৃত্যু।
২। দেশপ্রেম	কাজ করব।
৩। দেশপ্রেমের গুরুত্ব	নিবিড় ভালোবাসা।
৪। হয় স্বাধীনতা	শ্রদ্ধেয়।
৫। প্রজাদের জয়ধ্বনিতে প্রকম্পিত হলো	দেশপ্রেমিক হবো।
৬। আমরাও বিদুলার মতো	সৌবীর-রাজ্য।
৭। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য	অপরিসীম।
	মনুষ্যত্বের প্রসূতি।

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক ( ) চিহ্ন দাও :

১। রানি বিদুলার কাহিনী কোন গ্রন্থের অন্তর্গত ?

ক. রামায়ণের খ. পুরাণের
গ. উপনিষদের ঘ. মহাভারতের

২। সৌবীর-রাজ্যের রানি ছিলেন কে ?

ক. অবলা খ. মৃদুলা
গ. বিদুলা ঘ. চপলা

৩। রানি বিদুলার কয়জন পুত্র ছিলেন ?

ক. একজন খ. দুজন
গ. তিনজন ঘ. চারজন

৪। রানি বিদুলার পুত্রের নাম কী ?

ক. বিজয় খ. সঞ্জয়
গ. দুর্জয় ঘ. অজয়

৫। সৌবীর-রাজ্য কে আক্রমণ করেছিলেন ?

ক. অঙ্গরাজ খ. বিদেহরাজ
গ. সিন্ধুরাজ ঘ. মগধরাজ

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। দেশপ্রেম বলতে কী বোঝায় ?
২। দেশপ্রেমিক কীভাবে দেশের স্বাধীনতাকে রক্ষা করেন ?
৩। দেশপ্রেম মানুষের মধ্যে কী সৃষ্টি করে ?
৪। রানি বিদুলা পুত্রকে ভর্ৎসনা করলেন কেন ?
৫। 'শত্রুকে পরাজিত করে হারানো রাজ্য উদ্ধার কর' — উক্তিটি কে এবং কাকে করেছিলেন ?
৬। বিদুলা কেন সঞ্জয়কে যুদ্ধ করতে বলেছিলেন ?
৭। বিদুলা যুদ্ধ করতে বললে সঞ্জয় কী বলেছিলেন ?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। দেশপ্রেম কীভাবে প্রকাশ পায় ? বুঝিয়ে লেখ।
২। দেশপ্রেমের গুরুত্ব বর্ণনা কর।
৩। **স্বাধীনতা** রক্ষার জন্য মৃত্যু, সে তো বীরের মৃত্যু। — ব্যাখ্যা কর।
৪। স্বাধীনতা যুদ্ধে মৃত্যু হলে মানুষ মরেও অমর হয়ে থাকে। — ব্যাখ্যা কর।
৫। আমরা দেশকে ভালোবাসব কেন ? বুঝিয়ে লেখ।
৬। দেশপ্রেমিক বিদুলার কাহিনী লেখ।

নবম অধ্যায়

ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি : পূজা-পার্বণ ও ধর্মক্ষেত্র

আমরা জানি, হিন্দুধর্ম পৃথিবীর একটি প্রাচীন ধর্ম। হিন্দুধর্মের আরেকটি নাম 'সনাতন ধর্ম।' 'সনাতন' শব্দের অর্থ তো আমরা জানি — যা চিরন্তন, চিরস্থায়ী, নিত্য তার নাম 'সনাতন'। তাই হিন্দুধর্ম পূর্বে ছিল, বর্তমানে আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। এ কথাটি থেকে হিন্দুধর্মের প্রাচীনতার পরিচয় পাওয়া যায়।

হিন্দুধর্ম যুগ যুগ ধরে তার অনুসারীদের মধ্যে নৈতিক গুণের বিকাশ ঘটিয়েছে। সকল ধর্মকে সত্য বলে ভাবতে শিখিয়েছে। জীবকে ঈশ্বর জ্ঞানে সেবা করতে অনুপ্রাণিত করেছে। মন্ত্র, শ্লোক, উপাখ্যান প্রভৃতির মধ্য দিয়ে নৈতিক আদর্শ প্রচার করেছে। ভালো মানুষ হওয়ার প্রেরণা যুগিয়েছে।

ঋষি-কবিরা মন্ত্রে যে দেব-দেবীর রূপের ধারণা দিয়েছেন সেই ধারণা অনুসারে প্রতিমা নির্মিত হয়েছে। একেক দেব বা দেবীর একেক রূপ। সে রূপের কত না বৈচিত্র্য।

রূপে, অলংকারে, বাহনে, অস্ত্রে, বাদ্যযন্ত্রে বা পত্রে-পুষ্পে বিভূষিত দেব-দেবীর দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হই আমরা। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি। ভক্তিতে মাথা নত হয়ে আসে।

এ দেবতাদের হিন্দুরা মন্দিরে মন্দিরে স্থাপন করেছে। সেই মন্দিরগুলোর কী শোভা! কী সুন্দর তার কারুকাজ! যেমন — দিনাজপুরের কান্তজি মন্দিরগাত্রে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী, বিবাহ, যুদ্ধযাত্রা, নৌবিহার প্রভৃতি পোড়ামাটির ফলকে খোদাই করা হয়েছে। অপূর্ব তার সৌন্দর্য ও নির্মাণ কৌশল।

আবার মন্দিরগুলোকে কেন্দ্র করে, সাধু-সন্ন্যাসীদের আশ্রমকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ধর্মক্ষেত্র বা তীর্থক্ষেত্র।

পূজার নানা উপকরণেও রয়েছে নানা সৌন্দর্য। পূজা-পার্বণ উপলক্ষে যে আলপনা আঁকা হয়, তার সৌন্দর্য আমাদের অবাক করে দেয়। পূজা-পার্বণে মন্দিরের সাজ-সজ্জার সৌন্দর্যও উল্লেখযোগ্য।

২০২৫

কারুকাজ করা মন্দিরের ছবি

ধর্মসংগীত, ঈশ্বর ও দেব-দেবীর মাহাত্ম্য, কীর্তনের সুর-তাল-লয়, বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার, নৃত্য, নাট্য প্রভৃতির মধ্য দিয়ে শিল্পচর্চার পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলো কেবল হিন্দুধর্মাবলম্বী নয়, সকল ধর্মের, সকল মানুষের উপভোগ্য।

ধর্মক্ষেত্র, মন্দির, পূজা-পার্বণ প্রভৃতির মধ্যে ধর্ম ও জীবনের যে-সকল উপকরণের পরিচয় প্রকাশ পায়, তার নামই তো সংস্কৃতি। হিন্দুধর্মকে কেন্দ্র করে এক উন্নত সংস্কৃতির প্রসার ঘটেছে। এ সংস্কৃতি দেশ ও বিশ্বের কাছেও আদরণীয়।

হিন্দুধর্মকে কেন্দ্র করে এ সংস্কৃতি যুগ যুগ ধরে গড়ে উঠেছে। যুগের পর যুগ ধরে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। কালের ছোবলে অনেক কিছু ধ্বংস হয়ে গেলেও যা কিছু রয়েছে, তার মূল্য অপরিসীম। অতীতের কৃতি, অতীতের প্রজন্মের এ অবদানকে বলা হয় ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে নতুন সাংস্কৃতিক উপকরণ নির্মিত হয়। পূজা-পার্বণ, উৎসব-অনুষ্ঠান ও মঠ-মন্দির প্রভৃতির স্থাপত্য-নকশা কিংবা প্রতিমা নির্মাণের ঐতিহ্য গর্ব করার মতো। আমাদের কর্তব্য ঐতিহ্য রক্ষা করা এবং একে সমুন্নত রেখে তাতে নতুন সংযোজন ঘটানো। বর্তমান সংস্কৃতিকে ঐতিহ্যের আলোকে সাজানো।

আলপনা

উল্লেখ্য, দিনাজপুরের কান্তজি মন্দিরসহ এ ধরনের ঐতিহ্য সংরক্ষণে বিশ্বও এগিয়ে এসেছে। এ ধরনের মন্দির বা প্রতিষ্ঠানসমূহকে 'বিশ্ব ঐতিহ্য' বলে স্বীকার করে নিয়ে তার সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এ ঐতিহ্য আমাদের গর্ব। দেশের গৌরব – বিশ্বের পরম আদরের ধন।

ঐতিহ্যের প্রকাশ ঘটেছে, এমন চারটি উপাদানের তালিকা প্রস্তুত করি :

১।
২।
৩।
৪।

ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পরিচায়ক হিসেবে আমরা পূজা-পার্বণ ও ধর্মক্ষেত্র বা তীর্থক্ষেত্রের পরিচয় পেলাম। এখন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা মহালয়া, দোলযাত্রা এবং চৈত্রসংক্রান্তির পরিচয় তুলে ধরব।

২০২১

মহালয়া

মহালয়া একটি ধর্মীয় উৎসব। এর মধ্যে একাধিক ধর্মীয় কৃত্যের সমন্বয় ঘটেছে। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এ শুক্লপক্ষকে বলা হয় দেবীপক্ষ। আর দেবীপক্ষের অর্থাৎ আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের ঠিক আগের কৃষ্ণপক্ষকে বলা হয় অপরপক্ষ। এ অপরপক্ষের অমাবস্যা তিথিকে বলা হয় মহালয়া।

মহালয়া দুর্গাপূজার আগমনী উৎসব। মহালয়া এসে ঘোষণা দেয়, মা দুর্গা আসছেন।

অন্যদিকে এ মহালয়া প্রয়াত পূর্বপুরুষদের স্মরণ করে, তাঁদের শ্রদ্ধা জানানোর তিথি। এ তিথিতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রয়াত পূর্বপুরুষদের শ্রদ্ধা জানানো হয়। তাঁদের উদ্দেশে বলি : তোমরা চলে গেছ, আমরা আছি। তোমরা ভালো থেকো। আমাদের আশীর্বাদ করো, আমরাও যেন ভালো থাকি। তোমাদের ঐতিহ্য অনুসরণ করে আমরাও যেন মহত্ত্বের পরিচয় দিতে পারি।

এভাবে মহালয়া উপলক্ষে পূর্বপুরুষদের স্মৃতি তর্পণ করা হয়। মহালয়া উপলক্ষে সংগীতানুষ্ঠান, আলোচনা সভা প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশন মহালয়া উপলক্ষে বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে।

মোটকথা সকৃতজ্ঞ চিত্তে পূর্বপুরুষদের স্মরণ এবং দেবী দুর্গার আগমনী ঘোষণা মহালয়ার মূল উদ্দেশ্য। এর মধ্য দিয়ে ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়। আর ধর্মীয় উৎসবের আয়োজন যে সাংস্কৃতিক ধারা তাকেও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

দোলযাত্রা

ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের জীবনের একটি অবদান স্মরণ করে দোল উৎসব শুরু হয়। তা হচ্ছে একটি কুঁড়েঘর পোড়ানো। এক অসুর ছদ্মবেশে সেখানে আশ্রয় নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যদের ক্ষতি করতে চেয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ তা বুঝতে পেরে তাকে বিনাশ করেন। যে ঘরে অসুরটি ছিল, তার নাম 'বুড়ির ঘর'। উৎসবটিকে 'মেড়া' পোড়ানোও বলে। মেড়ার ঘর পোড়ানোর পর রাধাকৃষ্ণের পূজা করা হয়। পরের দিন শুক্লা পূর্ণিমাতে রাধাকৃষ্ণের প্রতিমা দোলায় রেখে আবির কুমকুম রাঙানো হয়। তারপর একে

২০২৫

অন্যকে আবির মাখিয়ে ধর্মীয় উৎসবকে আনন্দ উৎসবে পরিণত করা হয়। এর পরের দিন হোলি খেলা হয়। একে অন্যের গায়ে রং ছিটিয়ে আনন্দ করা হয়। রাধাকৃষ্ণ ও গোপগোপীরা এরকম হোলি খেলেছিলেন। দোল উপলক্ষে হোলি খেলা সে ঐতিহ্যের অনুসরণ।

রাধাকৃষ্ণের প্রতিমাসহ মন্দির থেকে শোভাযাত্রা বের করা হয়। আরেক জায়গায় প্রতিমাকে নিয়ে দোলায় চড়ানো হয়। এজন্য উৎসবটিকে বলে দোলযাত্রা। একালে এ রীতি অনেক জায়গায় অনুসরণ করা হয় না। রাধাকৃষ্ণের প্রতিমা মন্দিরেই রাখা হয়।

দোলযাত্রা উপলক্ষে একজনকে 'সঙ' বা হোলির রাজা সাজানো হয়। তারপর তাকে নিয়ে দল বেঁধে বাড়ি বাড়ি ঘোরা হয়। হোলির সময় রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক গান গাওয়া হয়। এর বিশেষ সুর ও রীতির জন্য এ গানগুলোকে বলা হয় হোলির গান।

দোলযাত্রার মধ্য দিয়ে সামাজিক মিলন, সংহতি ও সৌহার্দ্য প্রকাশ পায়। দোলযাত্রাও হিন্দুদের একটি ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় উৎসব।

চৈত্রসংক্রান্তি

চৈত্রসংক্রান্তি উৎসবের মধ্যে ধর্মীয় ও সামাজিক নানা বিষয়ের প্রতিফলন ঘটেছে। তাই এ উৎসব যেমন ধর্মীয়ভাবে পালিত হয়, তেমনি সামাজিকভাবেও পালিত হয়।

চৈত্রসংক্রান্তি বাংলা বছরের শেষ দিন। এ দিন পুরাতন বছরকে বিদায় দেওয়ার দিন। ধর্মীয়ভাবে স্নান, দান, ব্রত, উপবাস প্রভৃতির মধ্য দিয়ে চৈত্রসংক্রান্তি উদ্‌যাপিত হয়। এর সঙ্গে জড়িত উৎসব শিবের গাজন এবং গাজনের মেলা। চৈত্রসংক্রান্তির আরেকটি উৎসব চড়ক পূজা।

সারা চৈত্রমাস জুড়েই মেলা হয়। চৈত্রসংক্রান্তি তার শেষ দিন। চৈত্রসংক্রান্তির ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের। আজও তার ধারা বয়ে চলেছে।

এ-সকল ঐতিহ্যের অনুসরণ করে আমরা চলব। ভক্তিতে-শ্রদ্ধায়, আনন্দ-উৎসবে, মিলন-সংহতিতে আমরা এগিয়ে যাব। সকল মানুষকে ডেকে বলব, আমরা ঐতিহ্য থেকে মিলনের মন্ত্র শুনেছি। জেনেছি, মানুষের মধ্যে আত্মারূপে ঈশ্বর বিরাজ করেন। সেই মানুষ-ঈশ্বরের সেবা করে যাব, আজীবন।

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। হিন্দুধর্ম তার অনুসারীদের মধ্যে ______ গুণের বিকাশ ঘটিয়েছে।
২। দেব-দেবীদের রূপের ধারণা দিয়েছেন ______ ।
৩। ধর্মসংগীতের মধ্য দিয়ে ______ পরিচয় পাওয়া যায়।
৪। মহালয়া ঘোষণা দেয় দেবী দুর্গার ______ ।
৫। এ-সকল ঐতিহ্যকে আমরা ______ রাখব।

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। ঐতিহ্যের পরিচয় পাওয়া যায়	শিল্পচর্চার পরিচায়ক।
২। মন্দিরগুলোর কারুকার্য	ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করা।
৩। কান্তজি মন্দিরগাত্রের চিত্রকাহিনী	মর্মর পাথরে গড়া।
৪। ধর্মসংগীত	পোড়ামাটির ফলকে খোদাই করা।
৫। আমাদের কর্তব্য	আমাদের ঐতিহ্য।
	পূজার প্রতিমায়।

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। রামায়ণের কাহিনী খোদাই করা আছে —

ক. ঢাকেশ্বরী মন্দিরগাত্রে   খ. চট্টেশ্বরী মন্দিরগাত্রে
গ. কান্তজি মন্দিরগাত্রে   ঘ. জগন্নাথ মন্দিরগাত্রে

২। মহালয়ার তিথিটি হচ্ছে —

ক. একাদশী তিথি   খ. দ্বাদশী তিথি
গ. চতুর্দশী তিথি   ঘ. অমাবস্যা তিথি

৩। মহালয়া কোন পূজার আগমনী ?

ক. লক্ষ্মীপূজার   খ. দুর্গাপূজার
গ. সরস্বতীপূজার   ঘ. কালীপূজার

৪। হোলি খেলা হয় —

ক. দোলযাত্রার সময় খ. নববর্ষের সময়
গ. দুর্গাপূজার সময় ঘ. রথযাত্রার সময়

৫। চৈত্রসংক্রান্তির একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান —

ক. দুর্গাপূজা খ. হালখাতা
গ. শিবের গাজন ঘ. মনসাপূজা

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। ঋষি-কবিরা কিসের ধারণা দিয়েছেন?
২। আলপনা দেখে আমাদের মনোভাব কেমন হয়?
৩। 'অপরপক্ষ' বলতে কোন পক্ষটিকে বোঝানো হয়েছে?
৪। মহালয়ায় কাদের স্মরণ করা হয়?
৫। দোলযাত্রায় কাদের কুমকুমে রাঙানো হয়?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। ঐতিহ্য বলতে কী বোঝ? হিন্দুধর্মীয় ঐতিহ্যবাহী তিনটি উপাদানের পরিচয় দাও।
২। মহালয়া অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
৩। 'ধর্মসংগীতের মধ্য দিয়ে শিল্পচর্চার ঐতিহ্য প্রকাশ পেয়েছে।' — কীভাবে? সংক্ষেপে লেখ।
৪। বিশ্ব ঐতিহ্যের স্বীকৃতি পেয়েছে এমন একটি হিন্দুধর্মীয় ঐতিহ্যবাহী মন্দিরের নাম লেখ। কেন তার এই মর্যাদা?
৫। দোলযাত্রা উৎসবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
৬। চৈত্রসংক্রান্তির অনুষ্ঠান কেবল ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, তা সকলের এক মিলন মেলা।' – কীভাবে? বুঝিয়ে দাও।

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য, পঞ্চম শ্রেণি–হিন্দুধর্ম

সত্যই ধর্ম, ধর্মকে যে আশ্রয় করে
ধর্মই তাকে রক্ষা করে।
–শ্রী সারদা দেবী

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য